১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প
শৈলেন ঘোষের উপন্যাস
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছড়ায় গল্প

ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পেতে ট্যালকম পাউডার নয়, নাইসিল চাই।

HTB-GLL/88C6

নাইসিল লাগান

ঘামাচির কষ্ট থেকে চট্‌পট্‌ আরাম পান।

২ রকম কৌটোয় পাবেন—'নীল' আর 'চন্দন সুগন্ধে'

নাইসিল হ'ল এক ওষুধ মেশানো পাউডার। ঘামাচির সবরকম কষ্ট থেকে সঙ্গে সঙ্গে আরাম দেওয়ার জন্যেই এটি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। এটি চুলকানি, জ্বালাভাব থেকে নিমেষে আরাম দেয় আর ঘামাচি ছড়িয়ে পড়া রোধ করে, যা ট্যালকম পাউডার করতে পারে না।

নাইসিল—ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়।

১। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া নিবারণ করে। ২। ঘাম শুষে নেয়।
৩। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু নষ্ট করে। ৪। ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।

স্বাস্থ্যের উৎস

গ্ল্যাক্সো

আনন্দমেলা

৩ আশ্বিন ১৩৯১ ।। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ।। ১০ বর্ষ ৬ সংখ্যা

উপন্যাস
মানুষবলির জঙ্গলে (প্রথমাংশ) । শৈলেন ঘোষ ৩২
গল্প
কুস্তির প্যাঁচ । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৮
ভুটানি সোয়েটার । সুধীন্দ্র সরকার ২৭
বিনা টিকিটের যাত্রী । রঞ্জন ভাদুড়ী ৫১
ছড়ায় গল্প
অনাহারী প্রহরী । প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩
ধারাবাহিক উপন্যাস
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৫
শার্লক হোমসের গল্পমালা
লালচুল সমিতি । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৪৪
ইতিহাসের গল্প
মোগল দরবারে ইংরেজ ডাক্তার । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৫৫
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে । পঙ্কজ রায় ৫৯
লেখাপড়া
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৫
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৭
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৭
হাওড়া জেলা-স্কুল । অপরাজিতা ১৯
খেলাধুলো
তিন প্রধানের লিগ-সেনারা । সম্রাট রায় ৬২
বিজয়-রমেশ জ্বলে উঠে নিবে গেল । অশোক রায় ৬৩
অতুলনীয় ইয়ান বথাম । সুব্রত সিংহ ৬৪
উইলিসের অবসর । মণি শর্মা ৬৫
অস্ট্রেলিয়া আসছে । মণীশ মৌলিক ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬০, ফ্ল্যাশ গর্ডন ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা ১৭, শব্দসন্ধান ১৭, মজার খেলা ১৮
উত্তর বটে ১৮, হাসিখুশি ১৮
তোমাদের পাতা ৪৯

প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

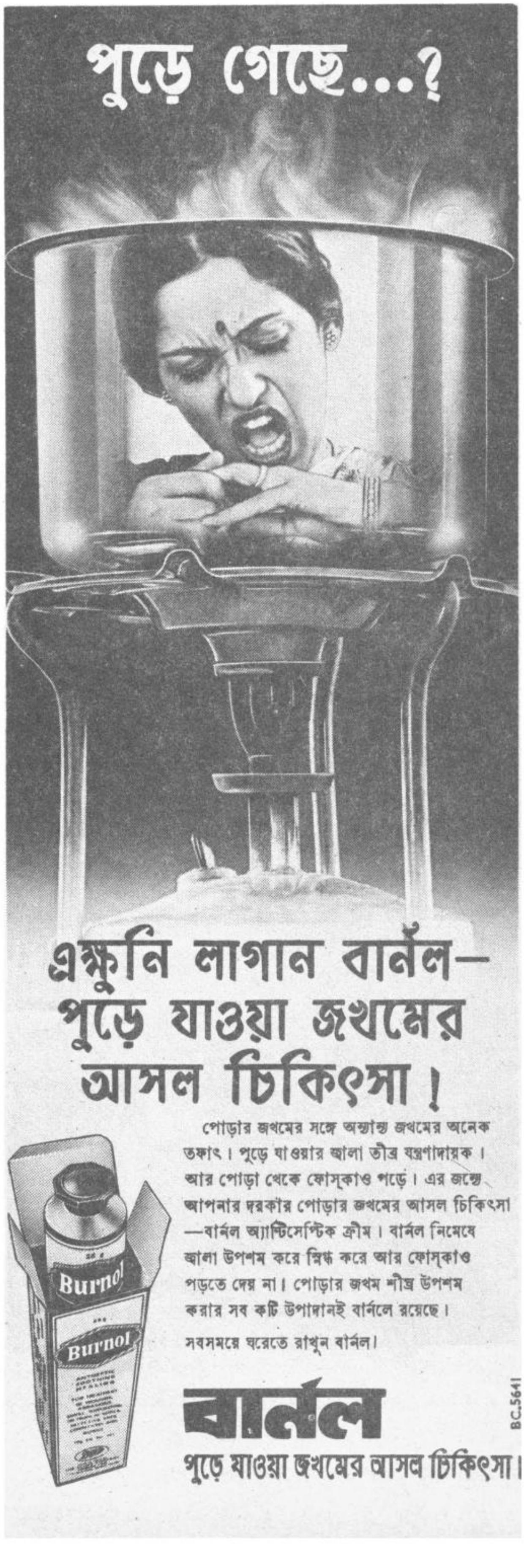

কিছু বস্তু জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, শতবর্ষ কেটে গেলেও যার বন্ধন অটুট থেকে যায়!

শতবর্ষ আগে হয়েছিল এক পরম্পরার উদয় —
আর ঐ উদয়-সূর্য্যের উজ্জ্বল ছটা, দুনিয়ার দূর-দূরান্তের
দেশে দেশে ছড়াতেই থেকেছিল······ ঘরে ঘরে,
দিদিমা থেকে নাতনী, সবার কাছে।

সেটি ছিল সানলাইট-এর পরম্পরা — বিশুদ্ধতা ও
কোমলতায় ভরা এই পরম্পরা, যার নিত্য পরিবর্তনশীল
এই যুগও না আজ পর্য্যন্ত পেরেছে কোনো পরিবর্তন
আনতে, আর না তা কোনোদিন পারবে। কারণ,বিশুদ্ধতার
ঐ পরম্পরাকে শত শত বর্ষ ধরে কায়েম রাখার জন্যে
যে আমরা শত কঠিন কাজও হাসিমুখে করতে তৈরী রয়েছি।

সানলাইট সাবান ১00 বছর ধরে চলে আসছে বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা

LINTAS SUN 11 2116 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

হাতে স্পিরিট পড়লে ঠাণ্ডা লাগে কেন

কয়েক ফোঁটা স্পিরিট, কিন্তু তা হাতে পড়লে ঠাণ্ডা লাগে কেন ? কিংবা ইনজেকশনের সুচ বিঁধোনোর আগে হাতে স্পিরিট ভেজা তুলো ঘসলেন ডাক্তার, অমনি হাতে ঠাণ্ডার অনুভূতি—কেন ?

স্পিরিট একটা উদ্বায়ী তরল। চট করে সে উবে যায়। ছিপি-আঁটা বোতলে না রেখে প্লেটে রাখলে উবে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু উবে-যাওয়া মানে অবস্থার বদল। তরল থেকে বাষ্পে রূপান্তর। এই রূপান্তরের জন্যে যে তাপের দরকার তা আসছে হাত থেকে। ফলে হাতের উত্তাপ পারিপার্শ্বিকের থেকে কমে যায়। সেইজন্যে হাতে ঠাণ্ডা লাগে।

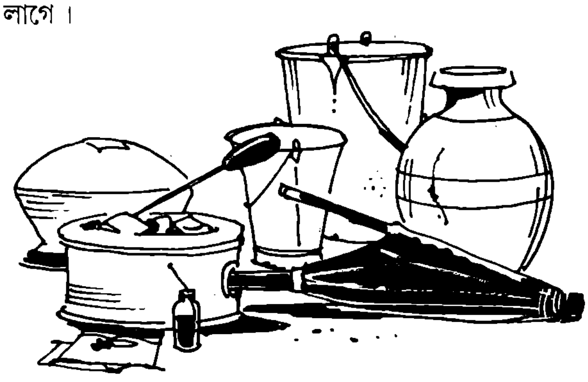

ঝালাই মানে কী

বালতি, হাঁড়ি, কড়া ফুটো হয়ে গেলে অনেক সময় রাংঝাল দিতে হয়। রাংঝালে সেই ফুটোর মুখ জুড়ে যায়। তখন আর সেই মুখ দিয়ে পাত্রে রাখা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে না।

গরম করে এই যে রাংঝাল দেওয়া, এই রাংঝালে কী থাকে ?

সাধারণত রাংঝালে থাকে সিসে আর টিন। দুই-ই মেশানো হয় সমান-সমান ভাগে। কিন্তু বিভিন্ন রকম কাজে ভাগের অদল-বদল করা হয়। দুটো ধাতু মিশিয়ে যা তৈরি করা হয়, তাকে বলে সংকর ধাতু।

যে সিসে আর টিন মিশিয়ে রাংঝাল তৈরি, সেই সিসে আর টিন অন্যান্য ধাতুর তুলনায় অনেক অল্প উত্তাপে গলে যায়। সিসে গলে যায় ৩২৭·৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। টিন আরও কমে, সে গলে ২৩১·৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ দুটোকে মিশিয়ে ঝাল দেওয়ার জন্যে যে ধাতুটা তৈরি করা হয়, তা আবার গলে সিসের চেয়ে কম উত্তাপে (২০০-৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।

ভাঙা, ফুটো জোড়া দেওয়ার সময়ে উত্তাপে কঠিন ঝাল নরম হয়ে গলে, কিন্তু যেখানে ঝাল পড়ে তা একই রকম থাকে। আর যেই উত্তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়, অমনি সেই ঝাল জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে আসে। ফলে, ফুটো বোজে আর ভাঙা জোড়ে।

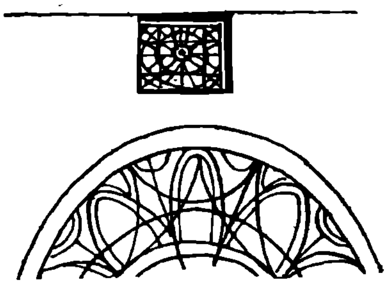

ভেন্টিলেটার উপরে কেন

সব রকমের ঘরেই ভেন্টিলেটার বা ঘুলঘুলি থাকে ছাদের কাছে। কেন ভেন্টিলেটার ঘরের ছাদ বা আলসের কাছে থাকে ? তা ঘরের নীচের দিকে থাকলে অসুবিধে কী ?

অসুবিধে আছে।

একটা ঘরের ভেতরের কথা ধরা যাক। স্বাভাবিক কারণে সেই ঘরে বাতাস আছে সর্বত্র।

লোকজনের উপস্থিতিতে ঘরের মেঝের কাছাকাছি বাতাসের উত্তপ্ত আর দূষিত হওয়ার আশঙ্কা যতটা, ছাদের কাছাকাছি বাতাসের কখনোই ততটা নয়।

বাতাস গরম হলে কী হবে ? তখন সে তুলনায় হালকা। প্রকৃতির ধর্ম এই যে, হালকা বাতাস উপরে উঠে যাবে। আর তা ঘরের বাইরে চলে যাবে ঘরের কাছের ঘুলঘুলি দিয়ে।

নীচের দিকের শূন্যস্থানও অপূর্ণ থাকবে না। নীচের বাতাস গরম আর হালকা হয়ে যেই উপরে উঠবে অমনি বাইরের মুক্ত বাতাস ছুটে এসে সেই জায়গা ভরাবে।

এইভাবে ঘরের বাতাস উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত মুক্ত বাতাস এসে পরিবেশকে অনুত্তপ্ত রাখার চেষ্টা করে।

ভেন্টিলেটার যদি উপরে না থাকত, তাহলে যে মুক্ত বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে, তার আর বেরোনোর পথ থাকত না।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

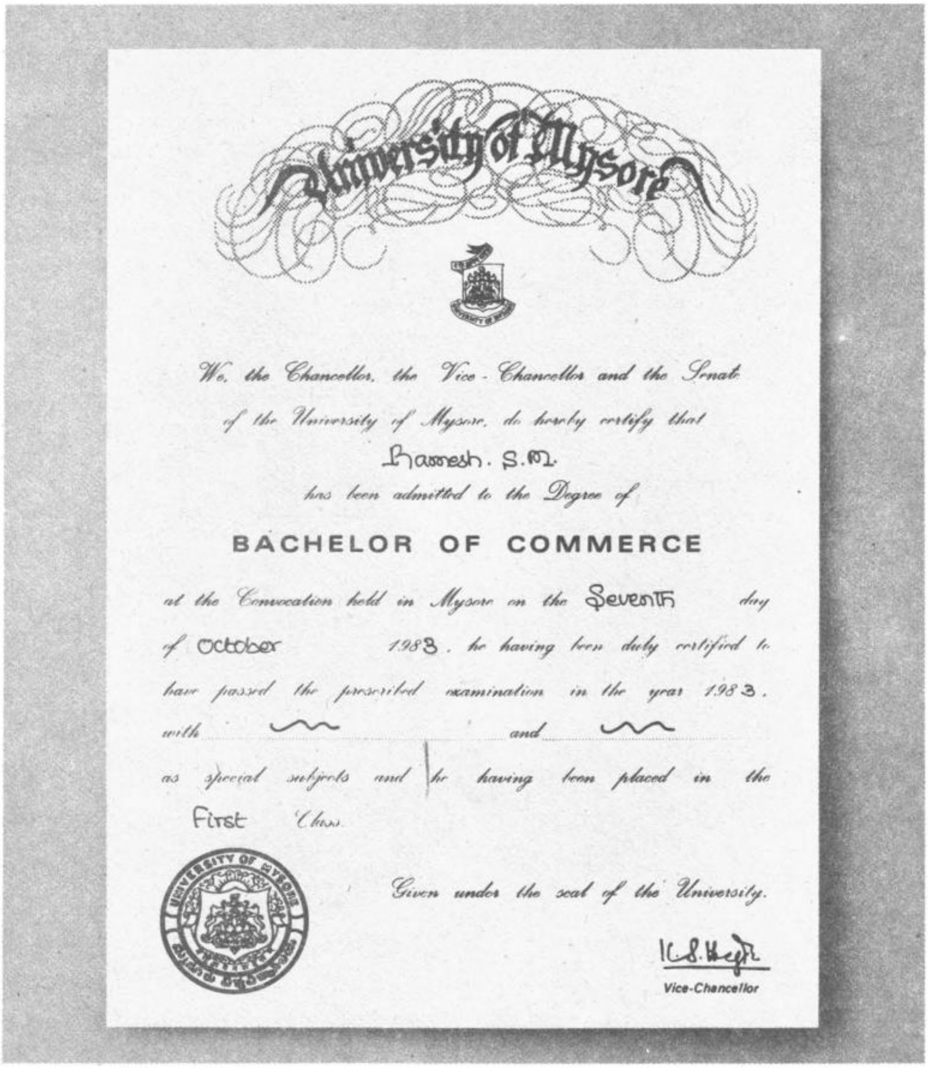

University of Mysore

We, the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Senate of the University of Mysore, do hereby certify that

Ramesh. S.M.

has been admitted to the Degree of

BACHELOR OF COMMERCE

at the Convocation held in Mysore on the Seventh day of October 1983, he having been duly certified to have passed the prescribed examination in the year 1983, with ~ and ~ as special subjects and he having been placed in the First Class.

Given under the seal of the University.

Vice-Chancellor

শুধু রমেশ নয়... এখন মিঃ রমেশ বি.কম !

কঠিন পরিশ্রমের সুখদায়ক ফল...
জীবনের শুভযাত্রা শুরু করার
বিরাট পল ! এক স্মরণীয় মুহুর্ত ...
শুভক্ষণটি অবিস্মরণীয়ও কত !

এই ক্ষণটি স্মরণীয় ক'রে রাখুন
ওর কাছেও — ওর পথনির্দেশ
করুন এই শুভক্ষণের দিকে, এখনই
একটি এইচ এম টি দিন ওকে !

এইচ এম টি নিয়ে এসেছে,
আপনার বেছে নেওয়ার মত ১২০ টি
মডেলের সম্ভার ! নির্ভরযোগ্য,
শক্তপোক্ত, নিখুঁত আর সময়ও সদা
নির্ভুল যার !

যে শুভক্ষণটি খুলে দেয় সুসময়ের দ্বার !

ওয়াচ ডিভিশন

hmt

জাতীয় সময়রক্ষী

কারখানা :
ব্যাঙ্গালোর (১ এবং ২),
শ্রীনগর, টুমকুর।

hmt ঘড়ি

তৈরী হয়েছে আপনারই জন্যে !

CLARION/HMT/84196/BEN

বাংলা বলো

অন্য যুক্তব্যঞ্জন কী বলে

"রান্নাঘরের দিকটা এত নিঃশব্দ কেন" শুনেই ভন্টু দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ফিরে এসে বলল, "মা বলছে, চিকেন স্যাণ্ডউইচ বানাতে কি ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ হয় ?" হিগিনকাকু লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, মানে, বৌদি তো একটু গুনগুন করে গানও গাইতে পারত রান্নাঘরে, তাতে চিকেন-স্যাণ্ডউইচের স্বাদ বাড়ত বই কমত না! যা হোক, এবার ভাষাবিজ্ঞানে—"

"আর সব যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে কোনো গোলমাল আছে ?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"ক্ষ আর জ্ঞ-এর কথা বলেছি তোমাদের। শব্দের গোড়ায় এ দুজনের উচ্চারণ যথাক্রমে খ আর গঁ, আর গোড়ায় না থাকলে কখ্ আর গ্গঁ। তুলনা করে দ্যাখো—

ক্ষয় [খয়্] অক্ষয় [অক্‌খয়]
ক্ষুব্ধ [খুব্‌ধো] বিক্ষুব্ধ [বিক্‌খুব্‌ধো]
ক্ষুর [খুর] গোক্ষুর [গোক্‌খুর]
ক্ষতি [খোতি] লক্ষ [লোক্‌খো]
জ্ঞান [গ্যান্] বিজ্ঞান [বিগ্‌গ্যান্, বিগ্‌গান্]
জ্ঞাত [গ্যাঁতো] অজ্ঞাত [অগ্‌গ্যাঁতো, অগ্‌গাঁতো]

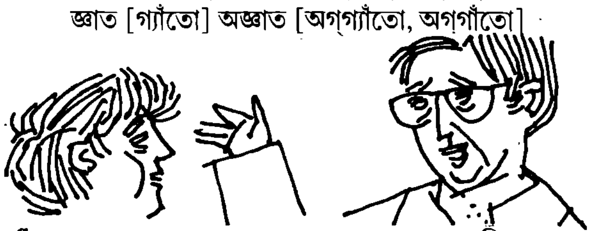

"আর ঋ-কার আর র-ফলার তফাত দেখিয়েছি আগে। শব্দের গোড়ায় দুয়েরই একরকমের উচ্চারণ—'পৃথিবী'র 'পৃ' আর 'প্রীতি'র 'প্রী'-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু শব্দের গোড়ায় না হলে—"

ভন্টুর বাবা বলে উঠলেন, "র-ফলার আগের ব্যঞ্জনটা ডবল হবে তো ? সে আর তোকে বলতে হবে না, সে আমরা আগেই ধরে নিয়েছি।"

বাবার ওপর ভন্টুর অভিমান হল একটু। সে-ই এ-কথাটা বলতে যাচ্ছিল।

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক। যেমন 'বিকৃত' [বি-ক্রিতো], কিন্তু 'বিক্রীত' [বিক্-ক্রিতো], 'মাতৃকুল' [মাত্রিকুল্] কিন্তু 'মৈত্রী' [মৈৎ-ত্রি]।

"আর তিন নম্বর যে-কথাটা ইম্‌পরট্যান্ট—তা হল—সেটাও 'ও' প্রসঙ্গে বলেছি, শব্দের গোড়ায় র-ফলা-ওয়ালা বর্ণ থাকলে তার 'নিহিত' অ-টা 'ও' উচ্চারণ হয়, যেমন প্রথম [প্রোথোম], দ্রবণ [দ্রোবোন্], শ্রবণ [স্রোবোন্], গ্রহণ [গ্রোহোন্]। কেবল 'ক্রন্দন'-এ অ-ও শুনতে পাই।"

এমন সময় প্লেটভর্তি স্যাণ্ডউইচ এসে ভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

বাচস্পতি

সহজে ইংরেজি

সিনেমায়

সে-দিন শনিবার ছিল। ইস্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে চম্বল তার বন্ধু চন্দনকে নিয়ে সিনেমার টিকিট কাটতে গেল। চার্লি চ্যাপলিনের দারুণ একখানা ছবি এসেছে। বাড়ির সবাই যাবে, বাবা চম্বলকে বলেছেন টিকিট কেটে আনতে।

While Chambal was waiting for his turn in the queue, Chandan was waiting along with him.

Suddenly Chambal was struck by an idea.

"Look Chandan, what are you doing tomorrow evening?" he said.

Chandan thought for a moment and replied that he wasn't doing anything important.

"Why don't you come along with us, then? I could buy a ticket for you, too. Are you coming?"

Chandan was doubtful.

"I don't know. I'll have to ask my father."

"Oh, come, now." Chambal said, "Your father is not going to say no. Do you want to come?"

"Of course I do. But I think I'd better ask Daddy first."

Chambal then said, "I'll tell you what I'm going to do. I'm going to buy a ticket for you. Anyway, if you don't turn up, I can always sell it off. I don't think it's going to be difficult. Look at the long queues for tickets."

পরদিন শো আরম্ভ হবার অনেক আগেই বাবা-মা'র সঙ্গে চম্বল আর চামেলি সিনেমা-হলে পৌঁছে গেল। আর-সবাই ভেতরে ঢুকে গেল, চম্বল নিজের আর চন্দনের টিকিট নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।

There was a great crush of people at the entrance. The show was sold out. But many were hanging around in the hope that there might be some with a ticket or two to spare.

Chambal was looking forward to a delightful evening .Chandan had telephoned to say he was coming after all.

"You know, Chandan," Chambal had told him excitedly, "We're having dinner at a Chinese restaurant after the picture."

Chandan, too, sounded excited on the phone.

"But it's about time he came," Chambal thought.

And there he was, smiling broadly

"Let's go in," Chambal said.

গতবারের মতো এবারেও দ্যাখো, ক্রিয়াপদের রূপটা বর্তমানকালের মতো হলেও, ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে পারে।

What are you doing tomorrow?
Are you coming?
We're having dinner at a Chinese restaurant after the show.
I'm going to buy a ticket for you.
I don't think it's going to be difficult.

প্রসাদ

কুস্তির প্যাঁচ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

যে লোকটা রোজ ভোর-রাতে উঠে দেড়শো বুকডন আর তিনশো বৈঠক দেয়, তারপর জিমনাস্টিকস করে, বালির বস্তায় ঘুষি মারে এবং কুংফু ক্যারাটে জুডো অভ্যাস করে, তার আবার মর্নিং ওয়াকের কী প্রয়োজন, এটা অনেকেরই প্রশ্ন। কিন্তু গোয়েন্দা বরদাচরণ এর জবাব দিতে পারবেন না। তবে এটা ঠিক যে, আজও প্রতিদিন সকালে তাঁকে দাদুর সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যেতে হয়। যখন থেকে হাঁটতে শিখেছেন, সেই তখন থেকে আজ অবধি রোজ।

বরদাচরণের দাদুর বয়স পঁচাশি। যৌবনকালে নামকরা কুস্তিগির ছিলেন। অনেক মেডেল কাপ শিল্ড পেয়েছেন। এখনও শালগাছের মতো ঋজু ও প্রকাণ্ড শরীর। রোজ কুড়ুল চালিয়ে দু'মন কঁরে কাট কাটেন। পুকুরে ঘণ্টাখানেক সাঁতরান। কুয়ো থেকে বিশ-ত্রিশ বালতি জল তোলেন। যৌবনে গোটা একটা খাসির মাংস খেয়ে ফেলতে পারতেন। ডিম খেতেন দু'ডজন করে। আধ সের ঘি। পাঁচ সের দুধ। এখন আর অত খান না। তবু যা খান, তা তিনটে লোকের খোরাক। সকালে উঠে পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করতে প্রাতঃভ্রমণ তাঁর নিত্যকর্ম। এখনও তাঁর চুল পাকেনি। দাঁত পড়েনি, চামড়া কোঁচকায়নি। পঁচাশি বছরেও দিব্যি সুঠাম চেহারা অম্বিকাচরণের। তবে কিনা লোকটা একটু বাতিকগ্রস্ত। তাঁর কাছে সবকিছুই সেই আগের মতোই আছে, কিছুই পাল্টায়নি।

এই যে বরদাচরণ এখন পূর্ণযুবক, ইয়া দশাসই লম্বা চওড়া চেহারা, তার ওপর নামকরা গোয়েন্দা, এসব অম্বিকাচরণের খেয়ালই থাকে না। সকালে উঠেই তিনি দাঁতন করে, পুজোপাঠ সেরে থানকুনিপাতা আর কলি-ওঠা ছোলা খেয়ে হাঁক দেন, "দাদুভাই, অ দাদুভাই।" ডাক শুনে মনে হয় যেন তিন-চার বছর বয়সী নাতিকে ডাকছেন। সেই ডাক শুনে বরদাচরণ গুটিগুটি দাদুর কাছে এসে দাঁড়ান। তারপর দাদুর হাত ধরে পিছু পিছু বেরিয়ে আসেন। দাদু অম্বিকাচরণ যে ভাবে বহুকাল আগে ছোট্ট বরদাচরণকে সাবধানে নর্দমা পার করাতেন, এখনও তেমনি হাত ধরে নর্দমা পার করে দেন। গাড়ি ঘোড়া দেখলে বলেন, "সরে এসো দাদুভাই, চাপা দেবে যে!" কুকুর বা গোরু দেখলে হাঁহাঁ করে ওঠেন, হাতের লাঠিটা আপসাতে-আপসাতে বলেন, "যাঃ, যাঃ, দাদুভাই ভয় পেয়ে কাঁদবে!"

বরদাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কী আর করবেন! পরশুদিনও তিনি একজন ডাকাতকে ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমেছেন। গত মাসেই তিনি খুনি রঘুবীর সিংয়ের পিস্তলের মুখে পড়েছিলেন। এই তো সেদিন কুখ্যাত একদল হাইজ্যাকারের পিছু নিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এক বোয়িং সাতশো সাঁইত্রিশ বিমানের একেবারে কেবিনের মধ্যে দুর্দান্ত ফাইট করে চারজন বিমান-ছিনতাইকারীকেই ঘায়েল করে এলেন। কিন্তু দাদুকে সে-কথা কে বোঝাবে?

দাদুর সঙ্গে বরদাচরণের এই মর্নিং ওয়াক দেখে সবাই ভারী

অবাক হয়।

হঠাৎই একদিন একখানা ঘটনা ঘটল। যাকে বলা যায় বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। প্রায় ষাট বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক নবাবের বাড়িতে বিখ্যাত পাঞ্জাবি কুস্তিগির শের সিংকে অম্বিকাচরণ হারিয়ে দেন। তাই নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। নবাব খুশি হয়ে সোনায় বাঁধানো একখানা কাপ উপহার দিয়েছিলেন অম্বিকাচরণকে। এখনকার বাজারে সেই কাপটার দাম হেসেখেলে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তো হবেই। অম্বিকাচরণ একখানা কাচের বাক্সে যত্ন করে কাপটা রেখে দিয়েছিলেন। নিজ হাতে রোজ মোছেন, কেউ এলে দেখান। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কাপটা নেই। তার বদলে কাচের বাক্সে একটা চিরকুট পড়ে আছে। তাতে লেখা, "অম্বিকাভাই, লড়াইটায় জোচ্চুরি ছিল। তুমি আমাকে চিত করতে পারোনি। আমার কোমরটা মাটিতে লেগেছিল মাত্র। কিন্তু নবাবের ব্যাণ্ডপার্টি তখন এমন জগঝম্প বাজনা শুরু করে দিল, আর তাই শুনে তুমি জিতেছ ভেবে সব মেয়ে-বউরা এমন শাঁখ বাজাতে আর উলু দিতে লাগল যে, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ওরকম আওয়াজ আমি জীবনে শুনিনি। তোমাকে কাঁধে নিয়ে লোকের সে কী নাচ! আমি নবাবকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু কে কার কথা শোনে! নবাব আমাকে আমলই দিলেন না। সেই থেকে মনের মধ্যে আগুন পুষে রেখেছি। ইচ্ছে ছিল তোমাকে অনেক আগেই হারিয়ে দিয়ে প্রমাণ করি যে, তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কুস্তিগির। কিন্তু সেই সুযোগ আর এতকালের মধ্যে ঘটে ওঠেনি। নানা ধান্ধায় আমাকে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তবে সর্বদাই আমি তোমার খোঁজখবর রেখেছি। এতদিন বাদে ফের তোমার পাত্তা মিলেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তোমাকে পেলাম না। দেখলাম, সেই ট্রফিটা তোমার ঘরে আজও সাজানো আছে। দেখে পুরনো স্মৃতিটা চাগিয়ে উঠল। রক্ত গরম হয়ে গেল, হাত পা নিশপিশ করতে লাগল। সামনে তোমাকে পেলে রদ্দা লাগাতাম। যাই হোক, এই ট্রফিটা আমি আমার বলেই মনে করি। তাই এটা চুপিচুপি নিয়ে যাচ্ছি। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তবে আগামী কাল বেলা বারোটার মধ্যে জেমিনি হোটেলের বারো নম্বর ঘরে এসো। ট্রফিটি যদি নিতান্তই ফেরত পেতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে আর-একবার তোমাকে কুস্তি লড়তে হবে। যদি তুমি জেতো, তাহলে তোমাকে ট্রফি তো ফেরত দেবই, ওস্তাদ বলেও মেনে নেব। আর যদি তুমি হারো, তাহলে আমাকে ওস্তাদ বলে সেলাম জানাবে। ইতি শের সিং।"

এই চিরকুট পেয়ে অম্বিকাচরণ তো মহা খাপ্পা। বাতাসে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগলেন, "ব্যাটা শের সিংয়ের এত সাহস! সেদিন লড়াইতে যে ওর লেংটি খুলে নিইনি, তাই ওর

সাত জন্মের ভাগ্যি ! এমন প্যাঁচ মেরেছিলাম যে ব্যাটা একেবারে কুমড়ো-গড়াগড়ি। আবার বলে কিনা সেদিন ওই নাকি জিতেছিল। আয় না ব্যাটা, এখনও এই বুড়ো বয়সে ভেলকি দেখিয়ে তোকে এরোপ্লেন-প্যাঁচ মেরে ধোবিপাটে আছড়ে মারতে পারি কি না, দেখে যা !"

বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দাদুকে ধরে বসিয়ে পাখার বাতাস-টাতাস দিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে বললেন, "সেদিন কী ঘটেছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদিন পরে লোকটা আবার কুস্তি লড়তে চায় কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শের সিংয়ের বয়স এখন কত হবে বলো তো ?"

অম্বিকাচরণ একটু চিন্তা করে বললেন, "আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় তো হবেই। তা তার এখন নব্বইয়ের কম না।"

চোখ কপালে তুলে বরদাচরণ বললেন, "নব্বই ! এই বয়সেও লোকটা কুস্তি লড়তে চায় ? নাঃ দাদু, লোকটা দেখছি সাঙ্ঘাতিক।"

অম্বিকাচরণ মাথা নেড়ে বললেন, "সাঙ্ঘাতিক তো বটেই। শের সিংয়ের নাম শের সিং হল তো খালি হাতে একটা রয়েল বেঙ্গল বাঘ মেরে। আসামের জঙ্গলে বুনো মোষের সঙ্গেও নাকি একবার হাতাহাতি করেছিল। এমন দাপট ছিল যে, সহজে তার সঙ্গে কেউ লড়তে রাজি হত না।"

বরদাচরণ বললেন, "এ-রকম লোককে একবার চোখের দেখা দেখে আসা দরকার। চলো দাদু, কাল তোমার সঙ্গে আমিও যাব।"

পরদিন অম্বিকাচরণ নাতি বরদাচরণের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। জেমিনি হোটেল তাঁদের বাড়ি থেকে বেশি দূরেও নয়। দোতলায় উঠে বারো নম্বর ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে অম্বিকাচরণ বাজখাঁই গলায় চেঁচাতে লাগলেন, "কোথায় শের সিং ? বেরিয়ে আয় ব্যাটা। অম্বিকাকে চিনিস না ! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

ঘরের ভিতর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল। "এসেছিস ? সিংহের গুহায় শেষে ঢুকবার মতো সাহস হল তোর !"

বলতে বলতে দড়াম করে দরজা খুলে গেল।

শের সিংকে দেখে বরদাচরণের চোখ ছানাবড়া। পঁচাশি বছরেও তাঁর দাদু অম্বিকাচরণের স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল বটে, কিন্তু নব্বইতে শের সিং যেন প্রকৃতই সিংহ। ইয়া বুকের ছাতি, বিশাল দুটো শালখুঁটির মতো হাত, পাকানো মোচ, বাবরি চুল।

দুজনেই দুজনের দিকে কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন। পাছে এখানেই দুজনের লেগে যায়, সেই ভয়ে বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শের সিং জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কে ?"

অম্বিকা বললেন, "নাতি।"

শের সিং সঙ্গে-সঙ্গে ভারী নরম হয়ে বললেন, "নাতি ! তা আগে বলতে হয় ! এসো খোকা, এসো, তোমার দাদুর সঙ্গে ঝগড়া আছে বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো নেই। তা ছাড়া শিশুরা হচ্ছে জগতের আনন্দ।"

"খোকা" "শিশু" এইসব বিশেষণ শুনে বরদাচরণ হাসবেন, কি কাঁদবেন তা বুঝতে পারছেন না।

ঘরে ঢুকে বরদা দেখেন বেশ লম্বাচওড়া চেহারার এক যুবক বসে বসে একটা পেতলের গামলায় ঘুঁটনি দিয়ে বাদামের শরবত বানাচ্ছে।

শের সিং বললেন, "অম্বিকা, এই দ্যাখো, এ হচ্ছে আমার নাতি। ও ভাবে, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই সব সময়ে সঙ্গে-সঙ্গে থাকে।"

অম্বিকাচরণ যুবকটির থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "বাঃ বাঃ দিব্যি দেখতে হয়েছে তো খোকাটিকে !"

শের সিং বললেন, "কাজিয়া পরে হবে। আগে শরবত খাও।"

অম্বিকা বললেন, "শরবত না হয় খাচ্ছি। কিন্তু আমার বাড়িতে এ ক'দিন যে দুটো ডালভাত খেতেই হবে শের সিং।"

এরপর দু'পক্ষের বেশ সদ্ভাব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে দু'জনে নানা কথা কইলেন। হাসিঠাট্টাও হল। গল্পগুজবে অনেকটা বেলা কাবার করে অম্বিকা উঠলেন। বরদাচরণ স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন, দুই বুড়োর কুস্তিটা বোধহয় এড়ানো গেল।

কিন্তু বিদায় দেওয়ার সময় শের সিং হঠাৎ বললেন, "তাহলে অম্বিকা, কুস্তিটা কবে হচ্ছে ?"

অম্বিকাচরণ সতেজে বললেন, "যেদিন বলবে। কাল বললে কাল।"

"তাহলে কালই, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও। ফুটবল মাঠে দু'জনে নেমে পড়ব।"

"তাই হবে।"

খবরটা বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অতীতের বিখ্যাত পালোয়ান শের সিং যে এখনও বেঁচে আছেন তাই অনেকে জানত না, তার ওপর অম্বিকাচরণ যে একদা শের সিংকে হারিয়েছিলেন, সে-খবরও অনেকের অজ্ঞাত। সুতরাং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। রাতারাতি ফুটবল-মাঠের মাঝখানে কুস্তির মাটি তৈরি হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ার বেঞ্চি সাজানো হতে লাগল। ভিড় সামলানোর জন্য বাঁশের বেড়া তৈরি হল। সকাল থেকে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বাচ্চা কাতারে কাতারে এসে চারদিকে জায়গা দখল করতে লাগল। পঁচাশি বছরের একজন মানুষের সঙ্গে নব্বই বছর বয়সী আর-একজনের লড়াই। সোজা কথা তো নয়।

কিন্তু মুশকিল হল, অম্বিকাচরণের সকাল থেকেই শরীর খারাপ, সকাল থেকেই রোদে বসে বারবার বগলে থার্মোমিটার দিচ্ছেন। বরদাচরণকে ডেকে বলছেন "দ্যাখ্ তো দাদু, কত উঠল।"

বরদাচরণ থার্মোমিটার দেখে বলেন, "সাড়ে সাতানব্বইতেই তো দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।"

"থার্মোমিটারটা তাহলে একেবারেই গেছে। আমার তো মনে হয় এক শো এক-এর কম না। দে তো, আবার লাগিয়ে দেখি।"

বরদাচরণ দাদুর কপালে হাত দিয়ে বলেন, "রোদে বসে গা একটু গরম হয়েছে বটে, কিন্তু জ্বর বলে তো মনে হয় না।"

অম্বিকাচরণ খেঁকিয়ে উঠে বলেন, "তুই জ্বরের কী বুঝিস ? এ হল নাড়ির জ্বর। ভিতরে ভিতরে গুমরে-গুমরে ওঠে।"

বরদাচরণ বুঝলেন, দাদু লড়তে চান না, কিন্তু না লড়লেও নয়। চারদিকে খবর রটে গেছে। কাতারে কাতারে লোক আসছে লড়াই দেখতে।

বরদাচরণ বা অম্বিকাচরণ জানেন না যে, ওদিকে শের

সিংয়ের শিবিরেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভোররাত্রি থেকেই শের সিং তাঁর নাতিকে বলছেন, "দ্যাখো ভাই, আমার পেটে খুব ব্যথা হয়েছে।"

নাতি বলল, "জীবনে তোমার কোনোদিন তো পেটে ব্যথা হয়নি দাদু!"

শের সিং খিঁচিয়ে ওঠেন, "হয়নি বলেই কি হতে নেই? আমার দারুণ ব্যথা হয়েছে, মনে হয় কলেরাই হল বোধহয়।"

"কলেরা হলে তো ভেদবমি হয়।"

"তুই খুব বেশি জেনে গেছিস। কলেরা কতরকমের হয় জানিস? ভিতরে ভিতরে আমার ভেদবমি শুরু হয়ে গেছে।"

নাতি ফাঁপরে পড়ে গেল। লড়াই না হলে যে দাদুর সম্মান থাকবে না!

বেলা বাড়তে লাগল। অম্বিকাচরণ কম্বলমুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছেন, আর নড়াচড়ার নাম নেই। এদিকে শের সিং সেই যে বাথরুমে ঢুকে দরজা দিয়েছেন, আর বেরোনোর কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অগত্যা বরদাচরণ দাদুর অবস্থার কথা জানাতে শের সিংয়ের কাছে রওনা হল, আর শের সিংয়ের নাতিও নিজের দাদুর কথা জানিয়ে ট্রফিটা ফেরত দিয়ে আসতে রওনা হল অম্বিকাচরণের বাড়ি।

বরদাচরণ যখন শের সিংয়ের ঘরে এসে হাজির হলেন, তখনও শের সিং বাথরুমে।

বরদাচরণ খুব বিনয়ী গলায় ডাকলেন, "শেরদাদু! ও শেরদাদু!"

বাথরুমের ভিতর থেকে খুব সতর্ক গলায় শের সিং সাড়া দিলেন, "কে রে? কী চাই?"

বরদাচরণ খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "শেরদাদু, আমি বরদাচরণ, আমার দাদু অম্বিকাচরণের সকাল থেকেই টাইফয়েড।"

"অ্যাঁ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে, ব্যামো খারাপের দিকে যেতে পারে।"

"সত্যি বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সঙ্গে-সঙ্গে বাথরুমের ভিতরে একটা রণহুঙ্কার শোনা গেল। তারপর দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শের সিং হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে বললেন, "আরে এ তো আমি আগেই জানতাম। অম্বিকার মুরোদ কী তা সেই ষাট বছর আগেই আমার জানা হয়ে গেছে। লড়াইয়ের নামে যার জ্বর আসে সে আবার মরদ! ছোঃ ছোঃ।"

ওদিকে শের সিংয়ের নাতি কাচুমাচু মুখে গিয়ে অম্বিকাচরণের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, "অম্বিকাদাদু! ও অম্বিকাদাদু!"

"কে?" কম্বলের ভিতর থেকে অম্বিকাচরণ ক্ষীণস্বরে বললেন, "কে?"

"আমি শের সিংয়ের নাতি। দাদুর যে ভোররাত্রি থেকে খুব ভেদবমি হচ্ছে। ডাক্তার বলছে কলেরা।"

"সত্যি তো?"

"আজ্ঞে সত্যি। দাদু তো বাথরুম থেকে বেরোতেই পারছেন না।"

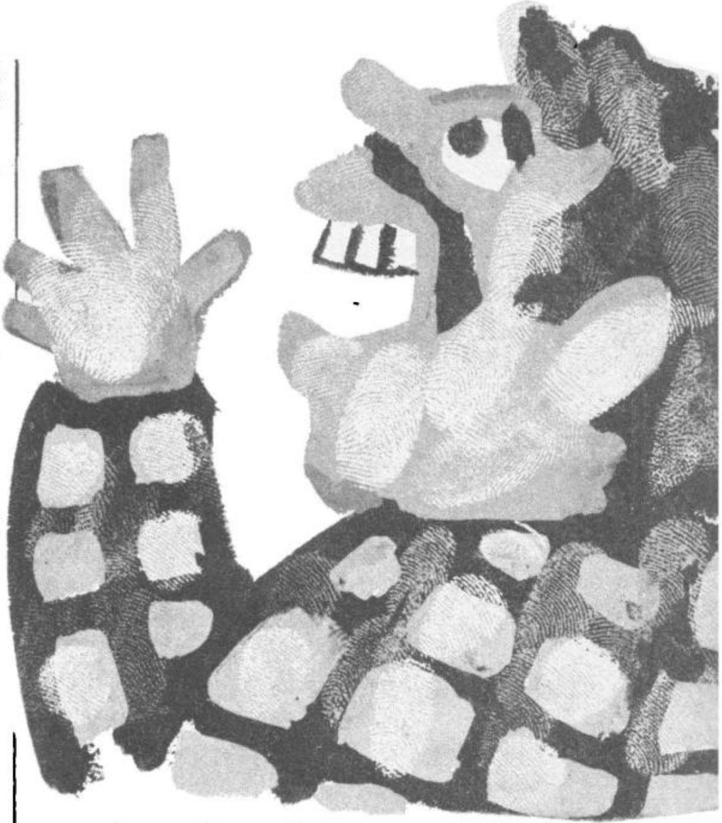

কম্বলটা এক ঝটকায় নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন অম্বিকা। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, "হবে না? ভয়ের চোটে পেটখারাপ হয়েছে। আমার আগেই জানা ছিল। মুর্শিদাবাদে সেই যে ওকে ধোবিপাটে আছাড় মেরেছিলাম, তা কি আর ও ভুলে গেছে?"

শের সিং আর অম্বিকাচরণ দু'জনেই ভাবলেন, লড়াইটা যখন হবেই না তখন ফুটবল-মাঠে গিয়ে জনসাধারণের সামনে বুক ফুলিয়ে ওয়াকওভার নিয়ে আসবেন।

দুজনেই তড়িঘড়ি রওনা হয়ে পড়লেন আসরে। অম্বিকা জানেন শের সিংয়ের কলেরা। শের সিং জানেন অম্বিকার টাইফয়েড। দুজনেই তাই নিশ্চিন্ত।

ফুটবল-মাঠ ভিড়ে ভিড়াক্কার। দুদিক থেকে দু'জনকে ঢুকতে দেখে লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। অম্বিকা ভাবলেন তাঁকে দেখেই লোকে হৈ-চৈ করছে। শের সিং ভাবলেন, তাঁকে দেখে।

হুঙ্কার দিয়ে দু'জনেই লাফিয়ে পড়লেন দঙ্গলে। তারপরই দু'জনে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে। কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

অম্বিকাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা হাত শের সিংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "দ্যাখো তো নাড়িটা। জ্বর মনে হয় একশো এক ছাড়িয়ে গেল।"

শের সিং নাড়ি ধরে বললেন, "দুইয়ের কম না। এবার আমার পেটটা একটু টিপে দ্যাখো তো, বড্ড ব্যথা।"

অম্বিকা শের সিংয়ের পেট টিপে দেখে বললেন, "ও বাবা, কলেরার একেবারে মস্ত একটা ডেলা দেখছি যে।"

ব্যাপারটা বুঝতে জনসাধারণের একটু সময় লাগল বটে, তারপর হোঃ-হোঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সমস্ত মাঠ।

ছবি: দেবাশিস দেব

শুধুমাত্র দুধ থেকে শক্ত আহারের দিকে পরিবর্ত্তন
আপনার বাচ্চার পক্ষে সহজতর করে তুলুন…

নেস্টাম: সহজতর পরিবর্ত্তনের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী বেবী সিরিয়াল।

আপনার শিশুর জন্যে সবসেরা জিনিষটিই আপনার চাই। সেই জন্যেই আপনি তাকে বুকের দুধ খাওয়ান —যা সবচেয়ে বেশী পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

যখন তার বয়স প্রায় চারমাস তখন তার শক্ত আহারেরও প্রয়োজন। কিন্তু তার হজমশক্তি তখনও অত্যন্ত কোমল। তখন তার প্রয়োজন এমন একটি সিরিয়াল যা সে সহজে হজম করে। যেমন, নেস্টাম।

প্রথম শক্ত আহার হিসেবে নেস্টাম আদর্শ কারণ তা চাল থেকে তৈরী। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে অন্যান্য যে কোনও সিরিয়াল থেকে নেস্টাম-ই হল সহজ পাচ্য।

দুধের সঙ্গে প্রস্তুত করলে, নেস্টাম পুষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যে পরিণত হয় আর এতে থাকে অতি প্রয়োজনীয় সবরকম পুষ্টিকর পদার্থ। শিশুর ত্বককে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে, তার দৃষ্টিশক্তিকে সচ্ছ ক'রে আনতে এবং তার রোগ প্রতিরোধের সহজাত ক্ষমতা বাড়াতে এতে রয়েছে সেইসব ভিটামিন। নেস্টামে যে আয়রণ আছে, তাতে রক্ত বিশুদ্ধ রাখে, এর ক্যালসিয়ামে করে হাড় ও দাঁত শক্ত।

দুধের সঙ্গে নেস্টামের ব্যবহার বহুমুখী। তা'ছাড়া সেদ্ধ ফল, রান্না করা ও চটকানো তরকারী এবং ডালের সঙ্গেও নেস্টাম দেওয়া চলে।

বিনামূল্যে!

আপনার শিশু তার খাবারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে। অতএব বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি ফোল্ডারের জন্যে লিখুন:

নেস্টাম
পোষ্ট বক্স নং 6016 নিউ দিল্লী 110 008

আয়রণ ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ

তৈরী করা খুব সোজা।

আগে ফোটানো কুসুম-গরম দুধ ঢালুন। | নেস্টাম মিশিয়ে নিন। | এবার খেতে দিন।

NESTLÉ®

নেস্টাম

বেবি সিরিয়াল

দুধের সঙ্গে মেশান

SAA/FSL/N/3150 BEN

SAA/FSL/N/3150 BEN

অনাহারী প্রহরী

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

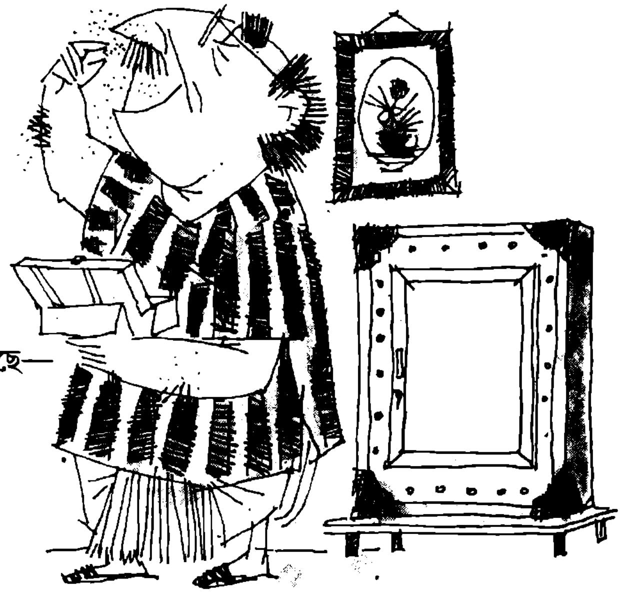

অশ্বিনী সেন নস্যি নিতেন সিকি কিলো প্রায় দিনে,
কলকাতা থেকে নিজে কড়া দেখে টিন শস্তায় কিনে
পাইকারি দরে আনতেন ঘরে। কাছেই পুকুর আছে,
জোলো আবহাওয়ায় ভাঁড়ারেতে যায় ড্যাম্প লেগে টিনে পাছে—
তেজ গিয়ে চ'লে বৃষ্টিবাদলে হয়ে যায় স্যাঁতসেঁতে,
রাখতেন তাই যত্নে সদাই 'আয়রন চেস্ট'-এতে !
মাসের খোরাক প্রায় দুই তাক বেবাক বোঝাই ক'রে
আড়াইশো গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম টিফিন-বাক্সে ভ'রে
'বেডরুম'-এ তাঁর। সাবধানে বার করে রোজ সিকি কিলো
মাল নিজ হাতে সিন্দুকটাতে চাবি দিয়ে রাখা ছিল।
কাজ তাঁর ঠিক রুটিনমাফিক। চাকরির সঞ্চয়
ছিল সব টাকা ব্যাঙ্কেতে রাখা, বাড়ি নিরাপদ নয়।
কাজ-চলা গোছ বাজার-খরচ নগদ দু'চারশো যা
থাকত বাড়িতে মাটির হাঁড়িতে চালের ভিতরে গোঁজা—
সন্ধান তার শুধু তিনি আর গৃহিণীই জানতেন।

সেদিন বিকেলে ঠিকে-ঝি'টি গেলে বাড়ি, সস্ত্রীক সেন
সপ্তমী রাতে গেছেন পাড়াতে ঠাকুর দেখতে সবে
সাজগোজ করে তালা দিয়ে দোরে ; ভিড় পূজামণ্ডপে.
পথ নির্জন, দেখে দুইজন চোর নিল সে-সুযোগ ;
তালা খুলে দোরে ঢুকল ভিতরে, (কপালেতে দুর্ভোগ
ছিল) দোতলাতে সুনিপুণ হাতে ঘর খুলে একে-একে
টর্চের আলো ফেলে দামি ভাল কী আছে কোথায় দেখে।
ক্রমে থলি ভরে বাসনে কাপড়ে ; লাগিয়ে নকল চাবি
ঢুকে এক ঘরে পড়তে নজরে আয়রন চেস্ট ভাবি'
'বড় দাঁও পেল' ভারী খুশি। গেল সেই সিন্দুকও খোলা
বহু চেষ্টায় দেখে শেষটায় সারি-সারি আছে তোলা
বাক্স তাহাতে ; তুলে দেখে হাতে নয়কো মোটেই ভারী,
ভাবে, নিশ্চয় আছে মণিময় গহনাই রকমারি।

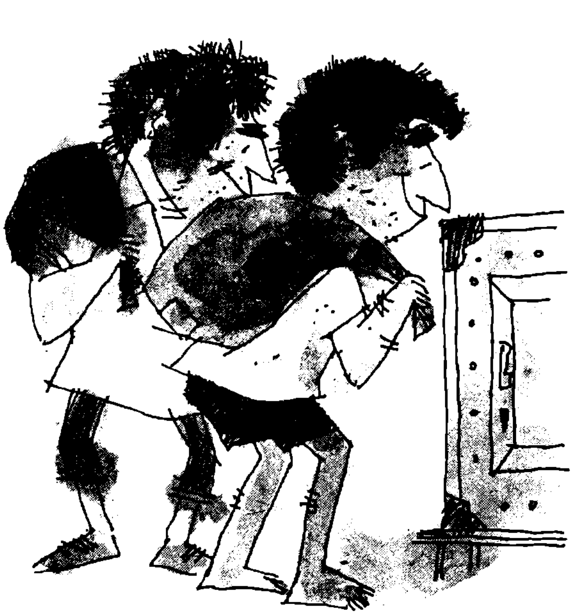

মহা উল্লাসে দুইজনে ঠাসে থলিতে যে পারে যত,
আপন আপন করে প্রাণপণ দোঁহে পাগলের মতো—
টিফিন-কৌটো, অতি চাপে দুটো থলিই ফাটল শেষে,
হুড়মুড় করে ভুঁয়ে গেল পড়ে সব মাল থলি ফেঁসে।
'কেস' বেগতিক, টর্চটাও ঠিক নিভল সময় বুঝে,
লোডশেডিংয়ের চলছিল জের শহরে তখন, খুঁজে
হাতড়ে আঁধারে যে যতটা পারে ছেঁড়া ঝোলাতেই ভরে
হয়ে বেসামাল চুরি করা মাল, হাত কাঁপে থরথরে
উদ্বেগে ঘোর। কোনো বাক্সর ঢাকনা আলগা ছিল,
নস্যিটা পড়ে মেঝেতে-কাপড়ে বিপদ বাড়িয়ে দিল।
দা-কাটা তামাকু তেড়েমেরে চাকু অনভ্যস্ত নাকে
দাপট আপন করল জ্ঞাপন। 'হ্যাঁচ্চো' 'হ্যাঁচ্চো' ডাকে
কেঁপে ওঠে পাড়া ; চোর দু'বেচারা তুর্কিনাচন নাচে।

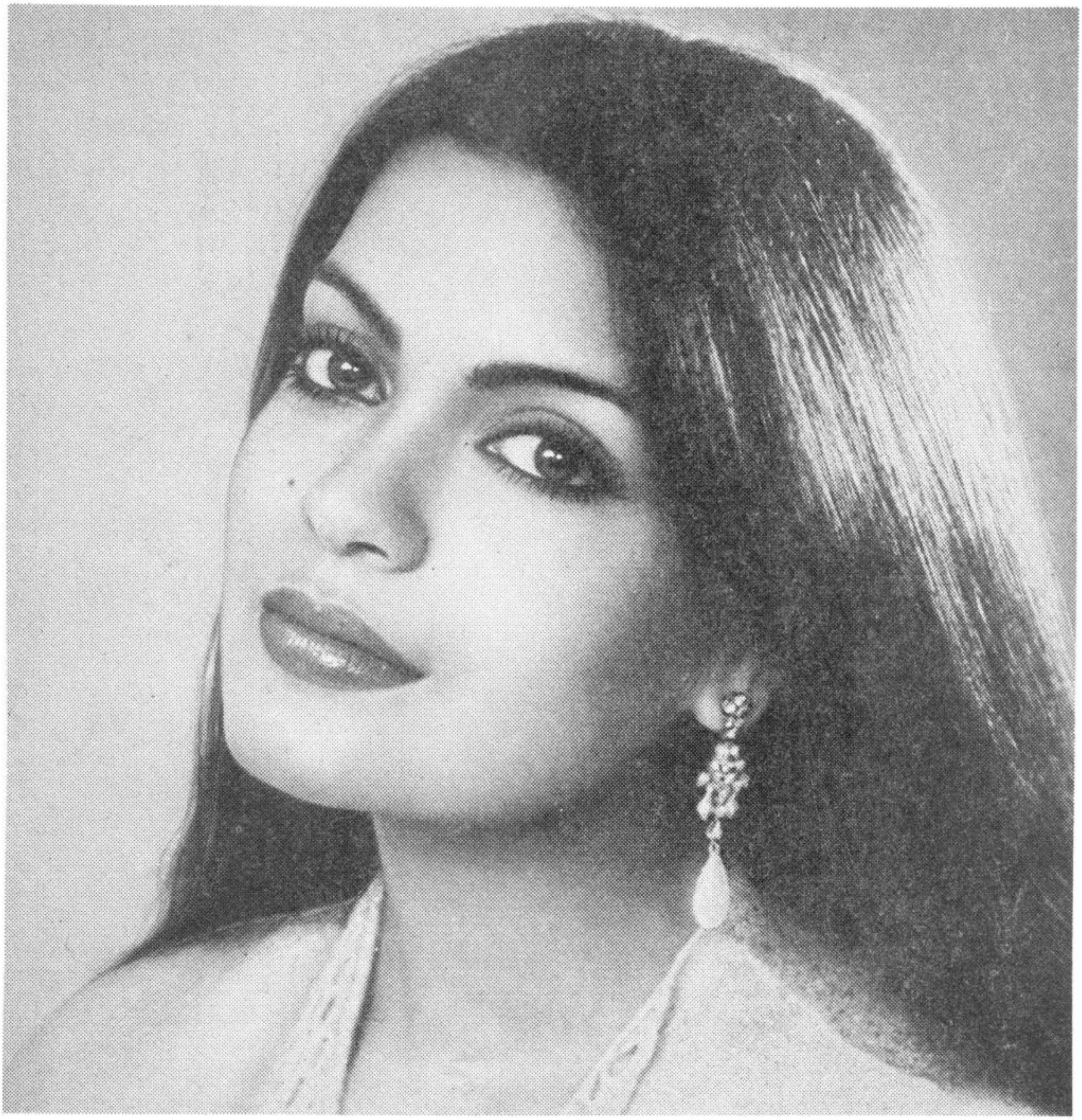

"কিছু প্রেমের জোয়ার, ভাসিয়ে নিয়ে চলে অনন্তকাল ধরে..."

Zeenat Aman

"যেমন আমার রয়েছে প্রবল প্রেম,
সঙ্গীতের প্রতি--বইপত্তরের সঙ্গে অপূর্ব প্রীতির
বন্ধন—অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা—
আর, অপরূপ লাক্সের সঙ্গে এই
মিষ্টিমধুর সম্বন্ধটিও"

শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।

HLL-9716

হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

সে-রবে বেয়াড়া প্রতিবেশী যারা ঘরে ছিল ধারেকাছে,
এল সেথা ছুটে, দোতলায় উঠে ব্যাপার বুঝতে পেরে—
দিল সবে মিলে লাথি চড় কিলে চোরেদের দফা সেরে।
তারা পায়ে ধরে বলে, "দয়া করে পুলিশেতে দিন, আর
মারবেন নাকো।" "সেই ভাল, ডাকো পাহারোলা এইবার।"
"হাতের সুখ তো হয়েছে, মুক্ত করে দাও," কেউ বলে,
ক্রমে বাড়ে ভিড়, পুলিশ হাজির, আলো উঠতেই জ্ব'লে—
শুনে গোলমাল চোরকে বমাল সে-ই যেন পাকড়েছে,
দিল পেয়ে ছুতো সেও দুটো গুঁতো। খবর ছড়িয়ে গেছে।
অশ্বিনী সেন বাড়ি ফিরলেন তাড়াতাড়ি, দোরে ভিড়,
দেখে তাজ্জব, শুনলেন সব। সারা পাড়া অস্থির।
পুলিশ এসেছে, চোরেরা ফেঁসেছে চোরাই-মালের সাথে,
প্রহরীর স্থান নেছে নিষ্প্রাণ নস্যের কৌটাতে।
দোতলার ঘরে মেঝের উপরে তখনো নস্যি ঢালা,
হাঁচি-বিহ্বল প্রতিবেশিদল, সিন্দুকে খোলা ডালা।
চোরেদের দশা দেখেই সহসা চোখে এল তাঁর জল,
"ছেড়ে দিলে আজ কখনো এ-কাজ আর করবি না বল্।"
দিয়ে নাকখত তারা রবে সৎ দিল তাঁর কাছে কথা,
পুলিশ না-ছাড়ে, দিতে হল তারে জানিয়ে কৃতজ্ঞতা
কিছু খেতে পান। পড়শিরা চান সকলে মিষ্টি খেতে,
ধরেছেন চুরি, তাঁদের কচুরি-শিঙাড়া-সন্দেশেতে
খুশি করে সেন বিদায় দিলেন। নস্যের বাক্সরা
মহাসম্মানে যে যাহার স্থানে সিন্দুকে ওঠে ত্বরা।
নাকেতে কাপড় বেঁধে ঘরদোর ধুলেন দু'জনে মিলে,
বিনা বেতনের প্রহরী তাঁদের কী যে হত না-থাকিলে।

ছবি : দেবাশিস দেব

সবচেয়ে কমদামে সবসেরা কোয়ালিটি

ঠিক তাই। এখনই পোলার পাখা কেনা সবচেয়ে লাভের কারণ বছরের কেবল এই মাসেই তা পাওয়া যায় সবচেয়ে কম দামে। এরপর প্রতিমাসেই দাম বাড়বে। সুতরাং আজই কিনুন — পোলার — আগামীকাল অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে।

পোলার

সুপার পাখা

আজ্ঞে হ্যাঁ

এ'টি ৭ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত

iaa 2448

ধাঁধা

ছোট্‌কার সেই ইংরেজি অভিধান ঘাঁটার জের যে এখনো মেটেনি, বরং নতুন-নতুন মজার ধাঁধা খোঁজার নেশায় ছোট্‌কা এখনো মশগুল, সেটা বুঝতে পারলাম এবারের নতুন ধাঁধা চাইতে গিয়ে।

"কী ? আরো কয়েকটা ক্যাঙারু-শব্দ দেব ?" ঘরে ঢুকতে না-ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করল ছোট্‌কা, "গতবার যেমন দিয়েছিলাম ?"

আমি একটু মিনমিন করেই বললাম, "অন্যরকম কিছু নেই ছোট্‌কা ? একঘেয়ে হয়ে যাবে না ?"

ছোট্‌কা আমার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "সেটাই কি আসল কারণ সতুবাবু ? না কি ইংরেজির ভয় ?"

"না-না, ভয় কেন ? বেশ তো মজার শব্দগুলো দিয়েছিলে সেবার।" আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম।

"বেশ।" ছোটকা বলল, "তাহলে ইংরেজি নিয়েই অন্যরকম ধাঁধা নাও !"

তা ছোট্‌কা বলে গেল, আমি লিখে নিলাম। সত্যি বলতে কী, আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম, এ ধাঁধাগুলো ততটা ভয়ঙ্কর নয়, ইংরেজির ব্যাপার হলেও, সোজাই বলা যায়। সোজা শুধু নয়, মজারও

প্রথম ধাঁধা ॥ চেনা ও বিখ্যাত দুটো ইংরেজি প্রবাদের ভাওয়েলগুলো আলাদা করে নিয়ে নীচে বাকিটুকু দেখানো হল—কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায়। উপযুক্ত ভাওয়েল বসিয়ে প্রবাদগুলো পড়তে পারো ?

(ক) LKBFRYLP

(খ) STTCHNTMSVSNN

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পাঁচ অক্ষরের এমন তিনটে ইংরেজি শব্দ লিখতে পারো, যার মধ্যে ইংরেজি পাঁচটা ভাওয়েলের একটাও নেই ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের ইংরেজি শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য কী কোথায় একের সঙ্গে অন্যের মিল, চোখে দেখে বলতে হবে—first stun, calmness, canopy, deft

গতবারের উত্তর ॥ (১) SEE, CUT, PART (২) UNTIE (৩) QUEUE

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১			■	২		৩
	■	■	৪	■	■	
৫	৬	■			৭	
■	৮					■
৯		■		■	১০	১১
১২		■		■	১৩	
১৪			■	১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ইন্দ্র। (২) কোন্ সাপ গোরুর সঙ্গে থাকে ? (৫) অলংকার তৈরির সময় সোনারুপোয় যা মেশানো হয়। (৭) গুরু দেন, শিষ্য নেন। (৮) লাল ফুলবিশেষ। (৯) দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। (১০) ফলবিশেষ। (১২) বিল। (১৩) খই। (১৪) বিশিষ্ট ধর্মগুরু। (১৫) সন্নিধান।

উপর-নীচ : (১) শত্রুর আক্রমণ থেকে নগর বা দুর্গ রক্ষা করত। (৩) বছর-বছর দিতে হয়, তৈরি যে সে পায় না ভয়। (৪) বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। (৬) যে-বারান্দা ঘরের কাজ করে। (৭) দেশলাই। (৯) সময়মতো বাজে, লাগে নানান কাজে। (১১) কুকর্মে সহযোগ।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

দি	তি	■	ম	নঃ	শি	লা
ৎ	■	মু	■	■	র	ক্ষা
সা	■	রা	শ	■	স্ত্রা	■
■	প	রি	ব	হ	ণ	■
■	ক্ষি	■	লা	ল	■	শ
মী	রা	■	■	স্ত	■	ত
ন	জ	রা	না	■	ক	দু

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই মাত্রই বারোটা দেশলাইকাঠি। বারোটা কাঠিকে নীচে দেখানো ছবির মতো করে টেবিলের ওপর সাজাও, বন্ধুদের সামনে।

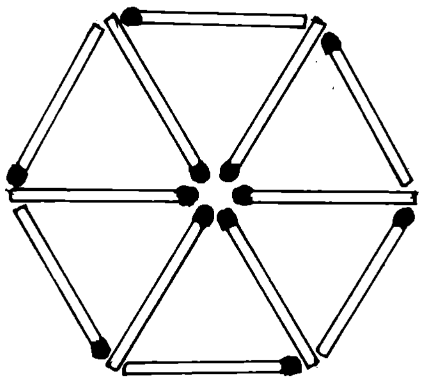

সাজিয়েছ ?

বেশ। এবার কোনো বন্ধুকে বলো, এর থেকে চারটেমাত্র কাঠি তুলে নিয়ে ফের এমনভাবে তাকে বসাতে হবে যে, তিনটে সমবাহু ত্রিভুজ দেখা যাবে টেবিলে।

মনে রেখো, তিনটে সমবাহু ত্রিভুজ বলছ, কিন্তু তিনটে সমান মাপের সমবাহু ত্রিভুজ বলছ না।

কারণ কী বলো তো ?

সেটা বললে তো উত্তরই বলা হয়ে যায়। তাই এখন সেটা বলব না। প্রথমে নিজে চেষ্টা করে দ্যাখো, তারপর তো সমাধান দেখে নেওয়া।

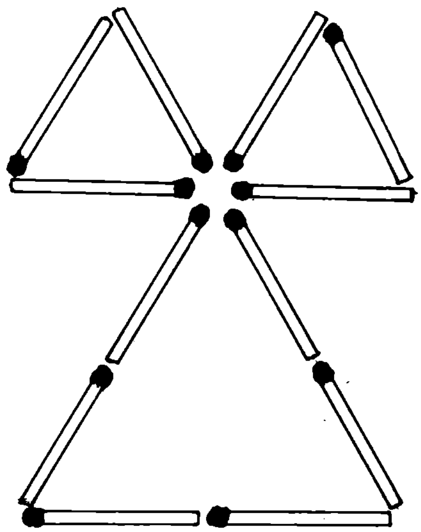

আর সেই সমাধানটা উপরে দেওয়া হল। কী, এবার বুঝলে তো, কেন অত সাবধানে শর্তটা বলতে হবে বন্ধুকে ?

মজারু

উত্তর বটে

প্রঃ কলিং বেলটা সারাতে লোক পাঠাতে বলেছিলাম, পাঠাননি কেন ?

উঃ লোক তো গিয়েছিল, বেল টিপে-টিপে কারও সাড়া না পেয়ে ফিরে এসেছে।

প্রঃ হায়, হায় ! দু-হাজার বছরের পুরনো ফুলদানিটা হাত থেকে ফেলে ভেঙে ফেললেন ?

উঃ যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আমি আশঙ্কা করেছিলাম এটা বুঝি নতুন।

প্রঃ আপনি চোখ বুজলেই দু-মাথাওয়ালা দানব দেখতে পান, এটা একটা মানসিক রোগের লক্ষণ। এ-রোগ সারানো যাবে, তবে হাজার টাকা খরচ পড়বে। পারবেন দিতে ?

উঃ আপনি বরং দানবটার একটা মাথা আপাতত কেটে দিন, আমার কাছে মাত্র ৫০০ টাকা আছে।

সুসেন

হাসিখুশি

"আমি কখনও ওরাং-ওটাং দেখিনি। কেমন দেখতে বলুন তো ?"

"ওই বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তাহলেই বুঝতে পারবে।"

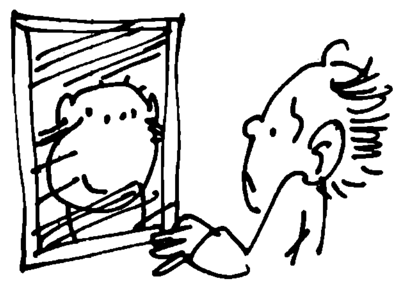

"একটা ঘড়ি কিনব। তিনশোটা টাকা দেবে ?"

"ঘড়ি তো তোমার আছে, আবার কী হবে ?"

"ঘড়ির সঙ্গে একটা কলম ফ্রি দেবে। একটা কলমের আমার খুব দরকার।"

"সবার উপরে মানুষ সত্য—এখানে মানুষ কী পদ বাবুয়া ?"

"দ্বিপদ স্যার।"

"সেদিন আপনি আমার হাত দেখে বললেন, আমি একজন ভাল খেলোয়াড় হব ; আর আজ বলছেন দার্শনিক ?"

"সেদিন আপনার হাত দেখার সময় আপনি যেভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিলেন, দেখে ভেবেছিলাম খেলোয়াড়ই হবেন।"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

হাওড়া কোর্টকে পিছনে রেখে দু'পা এগোতেই পাওয়া গেল বহু পুরনো ও বনেদি হাওড়া জেলা স্কুল। বিশাল বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি ভবন। আধুনিক ছিমছাম চারতলা বাড়ি, আবার বড়-বড় থামওয়ালা প্রাচীন বিদ্যালয়গৃহও আছে। ১৮৪৫ সালে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ধারাবাহিক ভাবেই ভাল। প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশজনই প্রথম বিভাগে পাশ করে। বাকিদের অধিকাংশই দ্বিতীয় বিভাগে।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমৃণালকান্তি বর্মণের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রায় ২৬ বছরের। তাঁর নিজের বিষয় বাংলা।

"পরীক্ষার প্রশ্নের ভাল উত্তর কীভাবে লেখা উচিত?" এই প্রশ্নের জবাবে মৃণালবাবু বললেন, "ভাল উত্তরের প্রথম শর্ত হল: উত্তর হবে নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ। তার প্রকাশভঙ্গি হবে প্রাঞ্জল ও সাবলীল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত জ্ঞানের পরিচয় মোটেই প্রত্যাশিত নয়। তবে নিজের জানা অংশটুকুই প্রনের ধরন অনুসারে ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে হবে। এর জন্য প্রচুর অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাসের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে জানা জিনিসও ঠিকমতো লেখা হয়ে ওঠে না। এ-বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।"

"ইংরেজি ও বাংলা কীভাবে পড়লে ভাল নম্বর তোলা যায়?"

"ইংরেজি ও বাংলা দুটি বিষয়েই আজকাল সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। সুতরাং পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া পাঠ্যবই পড়ার সময় ব্যাকরণের অংশও তৈরি করতে হবে। ব্যাকরণের মূল নিয়মগুলি আগে শিখে নিয়ে পাঠ্যবইয়ের ব্যাকরণাংশ অভ্যাস করতে হবে। ইংরেজিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে শুদ্ধ বাক্য গঠন করাটাই প্রধান সমস্যা। সে ক্ষেত্রে পাঠ্যবই বারবার পড়লে এবং সেই সঙ্গে সহজ ভাষায় লেখার অভ্যাস করলে দ্রুত উপকার পাওয়া সম্ভব। বাংলাতে বানানভুল ও গুরুচণ্ডালী দোষ এড়াতে হবে। মেধাবী ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও নানান ধরনের বই পড়ার অভ্যাস থাকা দরকার।"

অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক বললেন, "বিজ্ঞান প্রথম থেকেই বুঝে পড়া উচিত। প্রাথমিক ধারণাগুলিতে কোনো গোঁজামিল থাকলে চলবে না। কারণ, মূল বিষয়টি সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা না থাকলে নির্ভুল উত্তর দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে ছবি আঁকতে হবে। ভূগোলে অতি অবশ্যই ম্যাপ ব্যবহার করা উচিত। পড়ার সময় এবং লেখার সময়েও। ইতিহাসেও ঐতিহাসিক মানচিত্র ব্যবহার করলে বেশি নম্বর ওঠে।

তিনি আরও জানালেন, "কিশোর-কিশোরীদের কাছে পাক্ষিক আনন্দমেলার উপযোগিতা খুব বেশি। এই পত্রিকা তাদের সার্বিক চাহিদা মেটাতে পারে।"

অপরাজিতা

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

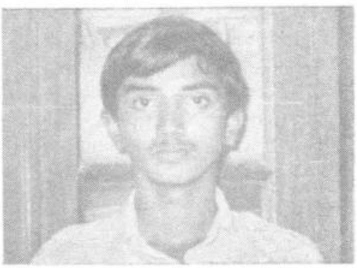

হাওড়া জেলা স্কুলে ক্লাস টেন-এ এবার ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সিদ্ধার্থশংকর মুসিদ। সিদ্ধার্থ ক্লাস ওয়ান থেকেই এই স্কুলের ছাত্র। ক্লাসে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এবারেই সে প্রথম ফার্স্ট হয়েছে। সেকেণ্ড হয়েছে রাজীব সাহা।

সিদ্ধার্থ থাকে হাওড়ার পঞ্চাননতলায়। বাবা সরকারি চাকরী করেন। সিদ্ধার্থ সাধারণত একলাই পড়াশোনা করে। তবে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। সিদ্ধার্থ এবার শতকরা ৭২ নম্বর পেয়েছে।

সিদ্ধার্থ বাংলায় রচনাংশের জন্য পি আচার্য এবং ব্যাকরণের অংশের জন্য বামনদেব চক্রবর্তীর বইটির সাহায্য নেয়। অঙ্কে কে সি নাগ ও নরেশচন্দ্র সমাজপতির বইটি তাকে দারুণ সাহায্য করে। জীন-বিজ্ঞানে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী এবং কুণ্ডু-দাস-কুণ্ডুর বই পড়ে। ভৌত-বিজ্ঞানে রঞ্জিত দাস—বিদ্যুৎকান্তি গুপ্ত এবং সুখেন্দু মাইতির বই। ভূগোলে পড়ে লোকেশ চক্রবর্তী ও ঘোষ-চট্টোপাধ্যায়ের বই।

সিদ্ধার্থ ক্রিকেট খেলতে ভালবাসে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে আছে। সে নিয়মিত আনন্দমেলা পড়ে। 'লেখাপড়া' বিভাগটি তার খুব কাজে লাগে।

বুঝেছি !
এই যাঃ !
দিলে তো ফেলে !
এঁকে চেনেন ?
না। কে ইনি ?
ইনিই ক্যালকুলাস ! সুতরাং ক্যালকুলাস আপনাকে মারেননি ! মেরেছে জাল-ক্যালকুলাস ! আসল ক্যালকুলাস ইতিমধ্যে পৌঁছে যান !
বোমাটা ফাটছে না কেন ?
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফাটবে !
ক্যালকুলাস এসেছিলেন, তার প্রমাণ ওই ছাতা ! জাল-ক্যালকুলাস তাঁকে বলে যে, সে-ই হচ্ছে বিজ্ঞানী টোপোলিনো···
বুঝুন ব্যাপার !
ওরে বাবা, এ তো ভীষণ ষড়যন্ত্র !
বুম
বোমা ফেটেছে! সবাই মরবে!
মিনিট কয়েক বাদে···
ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং
বাঁচাও ! বাঁচাও !
খুব লেগেছে ?
জানি না! সাবধানে টেনে তুলুন !
বোতলটা ভাঙেনি, এই ভাগ্যি !
আরও দুজন আছে ! আর একটা কুকুর !
খুব বেঁচে গেছি !
এবার অজ্ঞান হওয়া যাক !

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

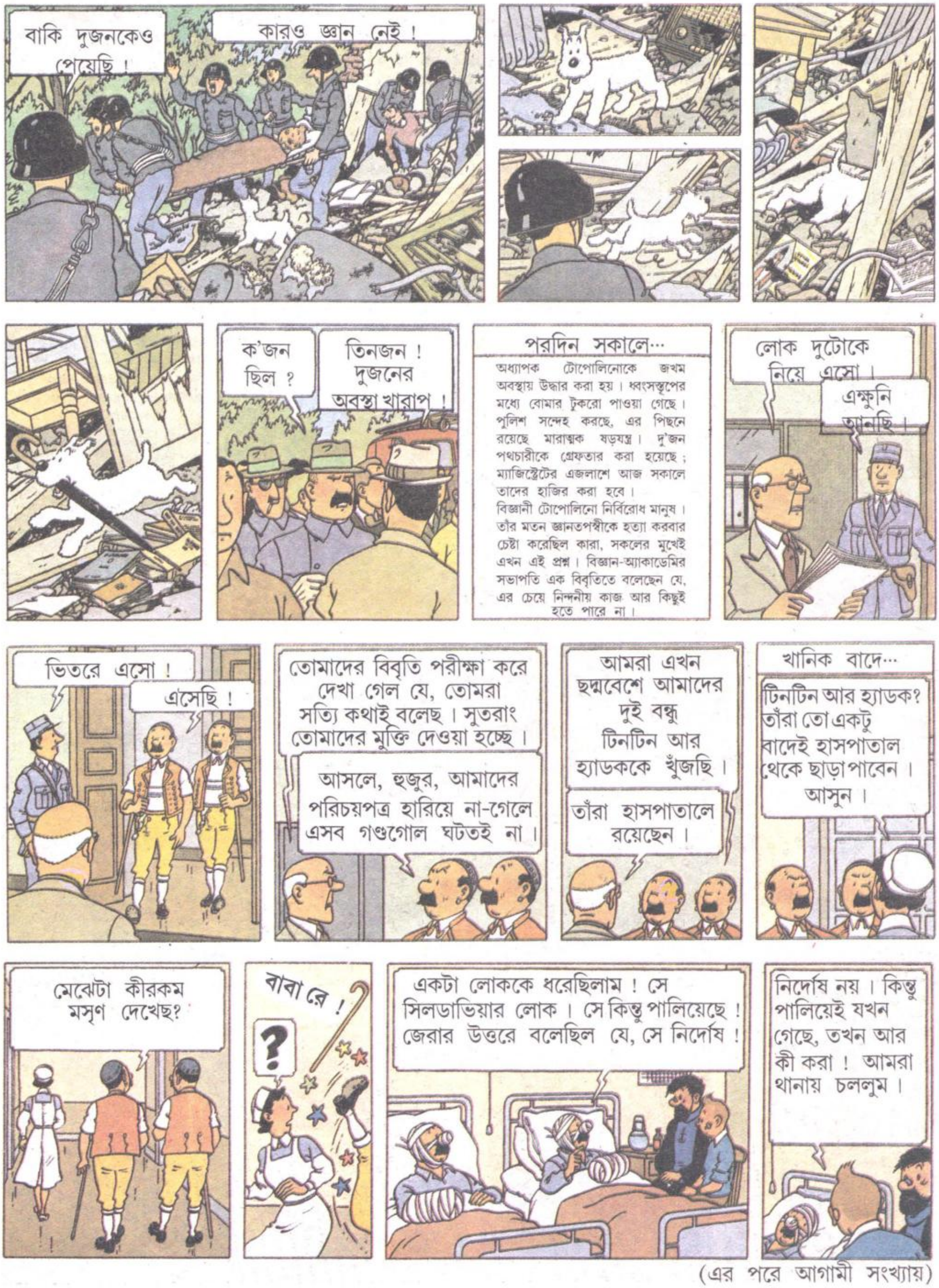

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রোভার্স দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের অনেকেই অসুস্থ। খেলা চলছে হেকলাভিকের সঙ্গে। না-জিতলে উয়েফা কাপ থেকে রোভার্স বিদায় নেবে। অগত্যা রয় নিজে নেমেছে। ফল এখন ০-০
রয়, তুমি তো অসুস্থ।
কিন্তু না-নেমে উপায় কী! জিততে হবেই!
ওরা দেওয়াল গড়ে তুলেছে!
দেওয়ালটা ভাঙতে হবে!
দর্শকরা জানে না, আমি অসুস্থ।
দেখা যাক কী হয়!
দুয়ো!
গোল করতে দেব না!
জিমি স্লেড থ্রো করেছে··· কিন্তু···
এ কী!
রেফারিটাও কানা!
ফ্রি কিক পেয়েছি! এগোও!
এগোচ্ছি!
মনে হচ্ছে, ভাল হয়ে উঠছি।
রয় ফ্রি কিক নিল···
ব্ল্যাকিকে বল দিয়েছে
জেড-প্ল্যানে এগোও!
ব্ল্যাকি বল দিল জিমি স্লেডকে···
বল গেল উইলি এডোয়ার্ডসের কাছে···
মারলেই গোল!

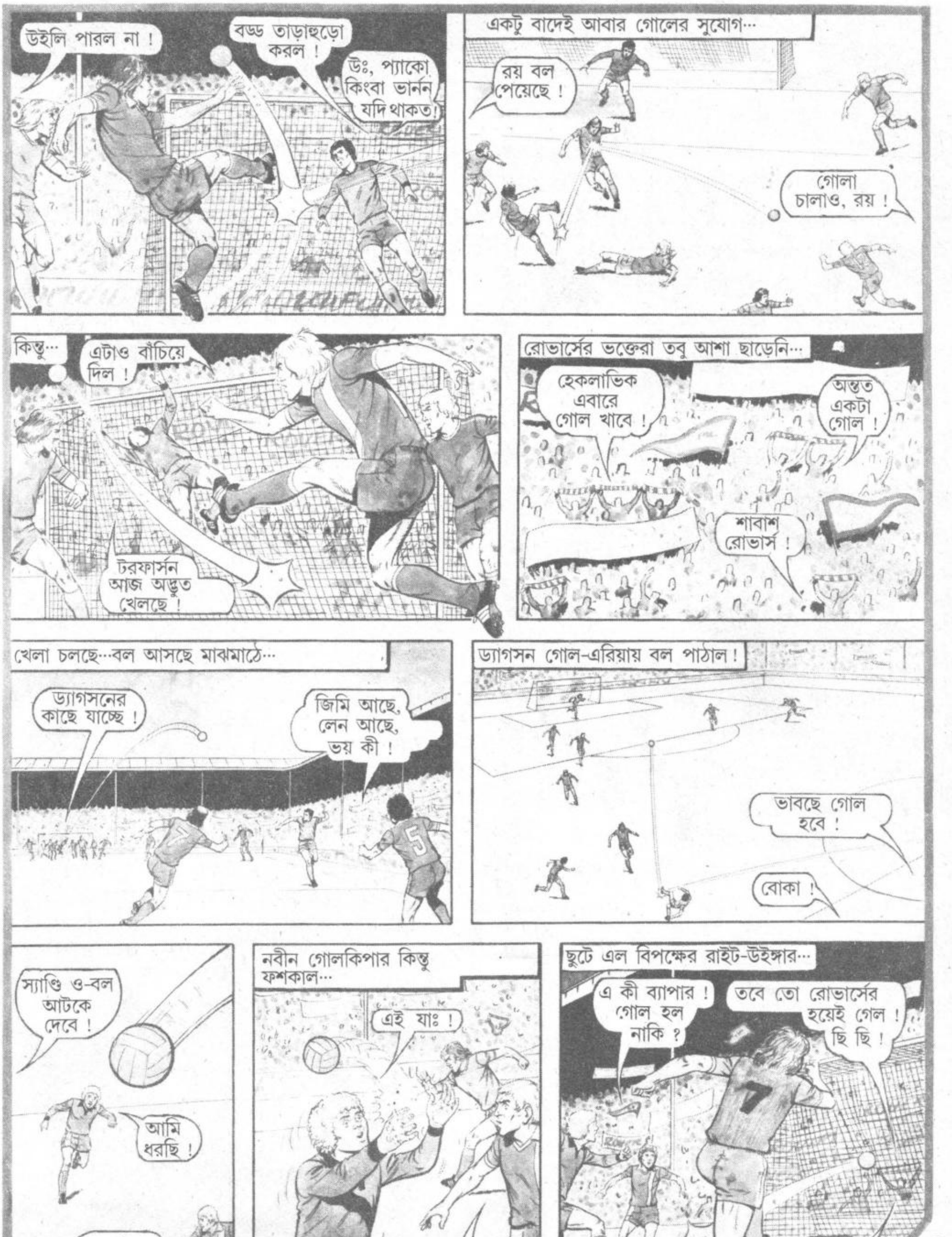

উইলি পারল না !
বড্ড তাড়াহুড়ো করল !
উঃ, প্যাকো কিংবা ভার্নন যদি থাকত!
একটু বাদেই আবার গোলের সুযোগ···
রয় বল পেয়েছে !
গোলা চালাও, রয় !
কিন্তু···
এটাও বাঁচিয়ে দিল !
টরফার্সন আজ অদ্ভুত খেলছে !
রোভার্সের ভক্তেরা তবু আশা ছাড়েনি···
হেকলাভিক এবারে গোল খাবে !
অন্তত একটা গোল !
শাবাশ রোভার্স !
খেলা চলছে···বল আসছে মাঝমাঠে···
ড্যাগসনের কাছে যাচ্ছে !
জিমি আছে, লেন আছে, ভয় কী !
ড্যাগসন গোল-এরিয়ায় বল পাঠাল !
ভাবছে গোল হবে !
বোকা !
স্যাণ্ডি ও-বল আটকে দেবে !
আমি ধরছি !
এই নিয়ে ও দ্বিতীয়বার বল ধরছে !
নবীন গোলকিপার কিন্তু ফশকাল···
এই যাঃ !
এ কী !
ছুটে এল বিপক্ষের রাইট-উইঙ্গার···
এ কী ব্যাপার ! গোল হল নাকি ?
তবে তো রোভার্সের হয়েই গেল ! ছি ছি !
খেলা শেষ হতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি !
দুর্বলতম টিমের কাছে রোভার্স আজ হেরে যাচ্ছে···
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

বেশী
সুস্বাদু
বেশী
সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা
প্রত্যেকটি চামচ
আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর
বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।

এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন ঃ
পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই (FCM-3) **400 025**

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর তার দিদি ইরানি বর্ধমানের এক গ্রামে এসেছে তাদের জ্যাঠামশাইয়ের খোঁজে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে নানারকম ফলের বাগান করছিলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরে তিনি লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে উধাও। লেবুবাগানের কয়েকটা গাছ কে যেন উপড়ে ফেলেছে। এখানে এককড়ি নামে একজন লোক রান্না করে, সে-লোকটা পাগলাটে ধরনের। তার ধারণা, গাছেরা মানুষের সঙ্গে কথা বলে। দিপু রাত্তিরবেলা একটা গাছের ঝাপটা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরে সে সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার মাঝরাত্তিরে চুপি-চুপি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর···

দিপুকে যেন কেউ ডাকছে, তার না গেলে চলবে না।

দিদিকে কিছু বলার উপায় নেই, তাহলেই দিদি বারণ করবে। কিন্তু দিপু এখন বুঝতে পেরেছে, ঐ লেবুবাগানের মধ্যেই কিছু রহস্য আছে।

দিপু বাইরের উঠোনে পা দিতেই তার মুখের উপর একটা গোলমতন আলো পড়ল। ঠিক টর্চের আলো নয়, অন্য ধরনের আলো।

দিপু ফিসফিস করে বলল, "যাচ্ছি!"

আলোটা তার সামনে পথ দেখাতে লাগল, দিপু সেই দিকেই চলতে লাগল এমনভাবে যেন সে ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

আলোটা যদিও সামনে, কিন্তু দিপুর পিছনে একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দিপু পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও।

এত রাত্রে এখানে একজনও জেগে নেই। এখানে কেউ পাহারাও দেয় না। তবে দূরের রাস্তায় একটা গোরুর গাড়ি চলার কচরমচর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দুলছে তার লণ্ঠনের আলো।

আলোটা কিন্তু দিপুকে লেবুবাগানের দিকে নিয়ে গেল না। দিপুকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাগানের বাইরে পুকুরটার দিকে।

পুকুরের ঘাটের পাশে একটা আগাছার ঝোপ। আলোটা দিপুর সামনে থেকে সরে গিয়ে সেই ঝোপটার ওপর পড়তেই হুড়মুড় করে তার ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল।

লোকটা একটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে আছে। গা'টা তেল-চকচকে। চোখের চঞ্চল দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় তার মতলব খারাপ।

দিপু কিন্তু লোকটাকে দেখে একটুও ভয় পেল না। শুধু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখের দৃষ্টি স্থির।

লোকটা আলো দেখেই বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু দিপুর হাতে টর্চ বা অন্য কিছু নেই দেখে বেশ অবাক। আলোটা ক্রমশ জোরালো হয়ে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

লোকটা বলল, "আমি···ইয়ে···এখানে একজনকে খুঁজতে এসেছি!"

"কাকে খুঁজতে এসেছ?"

"সে-কথা তোমাকে বলব কেন? তুমি কে হে? এদিক পানে তো আগে তোমায় দেখিনি!"

"আমার কথার উত্তর দাও!"

দিপুর গলায় রীতিমতন ধমকের সুর। লোকটার চেহারা বেশ বড়সড়, দিপুর মতন ছেলেকে তুলে আছাড় মারতে পারে। সে দিপুর ওরকম ভারিক্কিপনা দেখে চটে গেল বেশ।

সে বলল, "তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও তো খোকা। বেশি ফটর-ফটর কোরো না। আমার গোরু হারিয়েছে, গোরু খুঁজতে বেরিয়েছি।"

দিপু বলল, "মিথ্যে কথা। তুমি একটা চোর। রাত্তিরবেলা তুমি গায়ে তেল মেখে চুরি করতে বেরোও।"

"বেশ করি। চুরি করি তো তাতে তোমার কী?"

"তুমি আমার সময় নষ্ট করছ। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও!"

"এঃ! এইটুকুনি ছেলের তেজ কী? আমারে তুমি চেনো না···"

দিপু রাগ করে বলল, "তোমাকে আমি চিনতেও চাই না। যাও!"

লোকটি বলল, "তবে রে, আমার ওপর চোটপাট? দেখবি?"

লোকটির কোমরে একটা ধান-কাটা কাস্তে গোঁজা। সেটা তুলে সে দিপুকে মারতে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আকাশে চড়াত করে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার পরেই বজ্রপাতের আওয়াজ হল। আর তাতে তার হাতের কাস্তেটা জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

লোকটা 'ওরে বাবা রে, মা রে' বলেই দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

অমনি ঝরঝর করে বৃষ্টি নামল। মাত্র অল্প খানিকটা জায়গা জুড়ে সেই বৃষ্টি।

দিপু সেই বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

মাত্র মিনিটখানেক পরেই থেমে গেল সেই বৃষ্টি। গায়ে তেল-মাখা লোকটা আস্তে-আস্তে উঠে বসে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমার কী হয়েছে?"

দিপু বলল, "কিচ্ছু হয়নি, তুমি বাড়ি যাও!"

লোকটা বসে-থাকা অবস্থাতেই এমনভাবে দৌড় লাগাল যে, ঠিক মনে হল কোনো ওরাং-উটাং!

দিপুর ঠোঁটে ফুটে উঠল পাতলা হাসি। একটা চোরকে জব্দ করতে পেরে সে বেশ খুশি হয়েছে।

কী করে যে ঠিক সময়ে বজ্রপাত হল আর রহস্যময়ভাবে সামান্য একটু জায়গায় মোটে বৃষ্টি হল, সে সম্পর্কে দিপুর

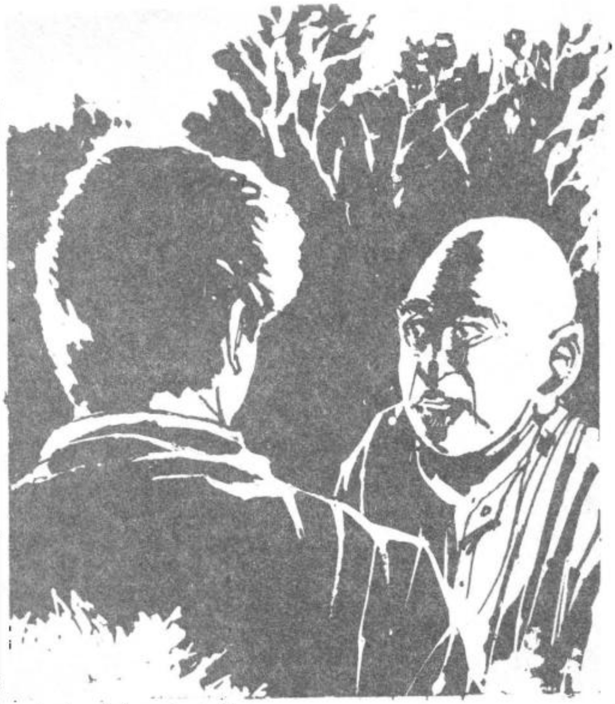

কোনো কৌতূহল নেই।

এবারে সে পুকুরের ঘাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে, হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার!"

দিপু আর ইরানি যখন প্রথম এসেছিল এখানে, তখন পুকুরটা ছিল প্রায় শুকনো। আজ সারা সন্ধে বৃষ্টির জন্যই বোধহয় এখন পুকুরটা জলে ভর্তি হয়ে একেবারে টইটম্বুর।

জলের দিকে পেছন ফিরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। টুকটুকে ফর্সা রং, মাথায় একটাও চুল নেই, ঠিক ডিমের মতন মাথা। লোকটি বেশি লম্বা নয়। গায়ে একটা আলখাল্লার মতন জামা। মুখখানা হাসি-হাসি।

আলোটা এখন সেই লোকটিকে ঘিরে আছে।

লোকটি বেশ কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলকভাবে দেখল দিপুকে। যেন সে দৃষ্টি দিয়ে দিপুর মনের ভেতরটা পর্যন্ত পরীক্ষা করছে।

তারপর সে যেন বেশ খুশি হল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি ভয় পাওনি আমায় দেখে, তাই না?"

দিপু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

লোকটি বলল, "আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তবু অনেকে ভয় পায়। তুমি সাধারণ ছেলেদের মতন নও। তুমি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাও, তাই না?"

দিপু বলল, "মাঝে-মাঝে পাই।"

লোকটি একবার ডান দিকে চকিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমায় আগে কখনও দেখতে পেয়েছ?"

দিপু বলল, "না।"

মাথায় চুল নেই, আর অত ফর্সা রং বলেই লোকটির ভুরু দুটো যেন বেশি কালো মিশমিশে মনে হয়। লোকটির কথার উচ্চারণ শুনলে মনে হয় কোনো অবাঙালি বাংলা শিখেছে। কিন্তু বাংলা কথায় কোনো ভুল নেই।

লোকটি দিপুর 'না' শুনে বেশ অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "তুমি আমায় আগে কখনও দেখনি? তবু তুমি আমি ডাকতেই এত রাত্তিরে চলে এলে? সত্যি তোমার সাহস আছে বলতে হবে!"

তারপর লোকটি আবার ডান দিকে তাকিয়ে বলল, "এঃ, আবার বিরক্ত করতে আসছে। আমার হাতে সময় খুব কম। ঐ চোরটা খানিকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল!"

দিপু ডানদিকে তাকিয়ে দেখল একটা কুকুর ছুটে আসছে তাদের দিকে।

কাছে এসে কুকুরটা বিরাট জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

দিপু কুকুর ভালবাসে। লোকটি আলখাল্লার ভেতর থেকে তার একটা হাত বার করতেই দিপু বলে উঠল, "ওকে মারবেন না!"

লোকটি বলল, "না, মারব কেন? আমি কারুকেই মারি না। ওকে শুধু চুপ করিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যি, সঙ্গে-সঙ্গে ডাক থেমে গেল কুকুরটার। সে লেজ গুটিয়ে পেছন দিকে দৌড় মারল।

লোকটি বলল, "আমার হাতে বেশি সময় নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?"

দিপু জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

লোকটি বলল, "সে-জায়গার তো কোনো নাম নেই। সে-জায়গাটা কোথায় তাও তোমাকে বোঝাতে পারব না। যেতে চাও তো আমি নিয়ে যেতে পারি। তবে ফিরে আসাটা তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করবে। তুমি যদি নিজে আসতে না চাও, তা হলে কিন্তু কেউ তোমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, আমি যাব, আবার ফিরেও আসব। তার আগে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কয়েকটা লেবুগাছ ওরকম ব্যবহার করছে কেন? তখন একটা লেবুগাছ আমাকে মারল। ঠিক মানুষের মতন। কোনো গাছ তো ওরকম করে না। ঠিক যেন হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিল আমাকে!"

লোকটি বলল, "বলব, বলব, সব বলব! আগে চলো আমার সঙ্গে।"

"চলুন!"

লোকটি এবারে এসে দিপুর কাঁধ ছুঁয়ে বলল, "তুমি এতক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ছিলে। এখন জাগিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।"

দিপুর সারা শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল। একবার চোখ বুজে তারপরই আবার চোখ মেলে তাকাল।

লোকটি মৃদু-মৃদু হাসছে।

দিপু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে? আপনি...আপনি..."

লোকটি বলল, "তুমি এই মাত্র যে স্বপ্ন দেখলে, তা কি তোমার মনে আছে?"

দিপু বলল, "হ্যাঁ। আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আপনি আমায় কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইলেন।"

"তুমি এখনও যেতে চাও আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে চলো!"

লোকটি তার আলখাল্লার খানিকটা অংশ জড়িয়ে দিল দিপুর গায়ে। (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

ভুটানি সোয়েটার

সুধীন্দ্র সরকার

"ভুলু, তোমার সোয়েটার এনেছি।" বাবা অফিস থেকে ফিরে ভুলুকে ডাকলেন। ভুলু পড়ার ঘর থেকে দৌড়ে এল, "কই, দেখি?"

বাবা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে বললেন, "পরে দেখো ঠিক হয় কিনা।"

ভুলু তড়িঘড়ি প্যাকেট খুলে সোয়েটারটা বের করল। মাথায় ঢোকাতে ঢোকাতে আয়নার কাছে গেল। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল ওর চোখদুটো. "দারুণ হয়েছে! চমৎকার ফিট করেছে!" তারপর লাফিয়ে চিৎকার করে মাকে ডাকল. "মা, দেখে যাও, সোয়েটারটা কী সুন্দর!"

রান্নাঘর থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, "এখানে এসো. দেখছি।"

ভুলু দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু পরেই ফিরে এল আবার। বাবা অফিসের প্যান্ট-জামা পাল্টে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে সাবান মাখাচ্ছিলেন। ভুলু বাবার পেছন থেকে আয়নাটা লক্ষ করল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে হাত বোলাল সোয়েটারের ওপরে।

লাল রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। বুকের মাঝখানে বেশ বড়সড় একটা কালো বেড়ালের মুখ। লাল রঙের ওপর কালো রঙের বেড়ালের মুখটা বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছিল। তবে. বেড়ালের চোখের লালরঙের মণিদুটোই যা বেমানান। বেড়ালের চোখ আবার লাল হয় নাকি? ভুলু ভাবল।

যাই হোক, সোয়েটারটা বেশ মানিয়েছে ভুলুকে। দারুণ স্মার্ট লাগছে। সোয়েটারের লাল রঙটা যেন রক্তের মতো টকটকে। উঃ, এত লাল! রক্ত দিয়ে কি সোয়েটারটা রঙ করেছিল নাকি? ভুলু বিড়বিড় করতে লাগল আপনমনে।

হঠাৎ আয়নার মধ্যে বাবার চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেললেন বাবা। ভুলুও হাসল। কিন্তু, আয়নার মধ্যে বাবার মুখটা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল। বাবার গাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল তখন!

ভুলু চিৎকার করে উঠল, "রক্ত!" ওর মনে হল গলার স্বরটা বোধহয় আটকে গেছে।

বাবা ওর চিৎকার শুনেও শুনলেন না। বরং একমনে দাড়ি কামাচ্ছিলেন তখন। ভুলু আতঙ্কে তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে। বাবা মাঝে-মাঝে আয়নার খুব কাছে মুখটা নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভুলুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললেন। ভুলু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। বাবা আবার দাড়ি কামাতে লাগলেন।

অত রক্ত দেখে মাথা ঝিমঝিম করছিল ভুলুর। ভয়ে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। কিছুতেই ভেবে পেল না, অতখানি কেটে যাওয়ার পরেও বাবার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছিল না কেন! ঘরে ঢুকেই সোয়েটারটা খুলে ফেলল। বেশ কষ্ট করেই খুলতে হল। সোয়েটারটা কেমন যেন এঁটে বসে গিয়েছিল গায়ের সঙ্গে। বারবার মনে হচ্ছিল গায়ের মধ্যে কে যেন নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে। দরদর করে ঘামছিল ভুলু।

"বাব্বা, কী গরম," বলেই চেয়ারে বসতে যাবে, তখনই কানে এল, "ভুলু, শিগগির এসো!" মায়ের গলা শুনেই ভুলু দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাবা আয়নার সামনে মুখ বিকৃত করে বসে ছিলেন। যন্ত্রণায় চোখ দুটি বুজে কাতর শব্দ করছিলেন মুখে। গালে তখনও সাবানের ফেনা লেগে। সেই ফেনা চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল টপটপ করে। দাড়ি কামানো তখনও শেষ হয়নি বোধহয়।

মা ভুলুকে লক্ষ করে বললেন, "দাড়ি কামাবার সময় কেটে গেছে।"

মা বাবার গালে টিংচার আয়োডিন লাগাতেই, বাবা 'উফ' বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

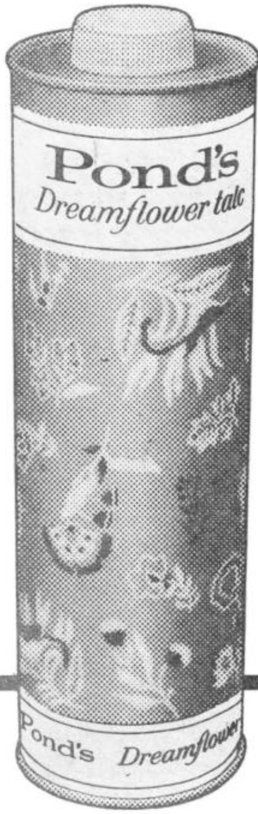

"এমন সুগন্ধ আর কোথায় আছে"

জীবনের যা প্রিয়
তা স্মৃতিতে রহে
তেমনই সজীবতা
এতে সদাই বহে

পণ্ডস্‌

ড্রীমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক

রক্ত তবুও বন্ধ হল না। ক্ষুরটা বেশ গভীর হয়ে কেটে বসেছিল।

ভুলু হতভম্ব। কী বলবে, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেক আগেই কাটতে দেখেছিল ও। বাবা কি তখন কিছুই বুঝতে পারেননি। জিজ্ঞেস করল, "কখন কাটল ?"

"এইমাত্র।" বাবা কোনোরকমে বললেন, "কেন যে সন্ধেবেলায় শেভ করতে গেলুম।"

বাবার কথায় যারপরনাই অবাক হল ভুলু। এইমাত্র কেটেছে ? আশ্চর্য ! কত আগেই ও নিজের চোখে বাবার গাল বেয়ে রক্ত ঝরতে দেখেছিল। উনি নিজেও আয়নার সামনে ছিলেন। রক্ত-টক্ত তখন কি কিছুই দেখতে পাননি। আর রক্ত যদিও সাবানের ফেনার আড়ালে উনি না দেখে থাকেন, কিন্তু যন্ত্রণা ? বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল ও।

পরে হাসপাতালে দুটো সেলাই দিতে হয়েছিল ক্ষতস্থানে। কাটা জায়গাটা জুড়তে বেশ কয়েকদিন ভুগিয়েছিল বাবাকে।

স্কুলে ভুলুর সোয়েটারটা দেখে ক্লাসের ফার্স্ট বয় বলল, "কী এমন সোয়েটার ! এ তো ভুটানিদের কাছে হরদম পাওয়া যায়।"

ভুটানিদের ভুলু রাস্তাঘাটে অনেক দেখেছে। প্রতি বছর শীতের আগে রাস্তায় রাস্তায় সোয়েটার, উলের চাদর, মাফলার ইত্যাদি বিক্রি করে। কেমন যেন দেখতে ওদের। লম্বা আলখাল্লার মতো জামা পরা পাহাড়ি চেহারাগুলো দেখলে বেশ ভয় করে। যাকগে, ভুটানিরা দেখতে যাই হোক না কেন, ওদের তৈরি সোয়েটার ওর খুব পছন্দ।

এরপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন। সোয়েটারের সম্বন্ধে ভুলুর উৎসাহ এখন আর অতটা নেই। রোজ পরতে হয় তাই পরে। সেদিনও সোয়েটারটা ওর গায়ে ছিল। মাসির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে বাবার সঙ্গে ফিরছিল ব্ল্যাক-ডায়মণ্ড এক্সপ্রেসে।

ঝড়ের গতিতে ট্রেন ছুটছিল হাওড়ার দিকে। জানালার ধারে সিট পাওয়াতে বেশ সুবিধেই হল ওর। ঘুটঘুটে অন্ধকার বাইরে। দৃশ্য দেখার কোনো সুযোগ নেই। লিমিটেড স্টপের ট্রেনটা শাঁ-শাঁ করে এক-একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছিল, আর ভুলুও 'ফেলুদা অ্যাণ্ড কোং' বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল এক-এক করে।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্পে মিঃ গোরে যখন নওলখা হারটা ফেলুদার কাছ থেকে ডাকাতি করার জন্য ট্রেনের কামরায় ঢুকেছে শাগরেদ নিম্মোকে নিয়ে আর নিম্মো ফেলুদার দিকে তাক করে রয়েছে রিভলভার, সেই জায়গাটা পড়তে পড়তে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল ভুলু। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে কামরার চারপাশে দেখল। ওদের কামরায় আবার ডাকাত-টাকাত ঢোকেনি তো !

কিন্তু সত্যি সত্যি ভূত দেখার মতো চমকে উঠল তখনই। ওদের কামরার মধ্যেই মিঃ গোরে আর নিম্মো ঘোরাফেরা করছিল তখন।

ভুলু জানে ট্রেন-ডাকাতি কোনো বিচিত্র ঘটনা নয়। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ে ট্রেন-ডাকাতির খবর ! কিন্তু বইয়ের চরিত্রদের জলজ্যান্ত ট্রেনের কামরায় দেখবে, এটা যেন ভাবতেই পারছিল না !

ভয়ে ঘামতে শুরু করল। ভুটানি সোয়েটারটা হঠাৎ গায়ে চেপে ধরতে শুরু করেছে। বুকের ওপর মনে হচ্ছিল একরাশ বোঝা। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে সোয়েটারটা খুলতে শুরু করল। হঠাৎ এত গরম লাগছিল যে, সোয়েটারটা গায়ে রাখা গেল না।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল ভুলু। ডাকাতরা, শুনেছে, মারধর করে। ওকে আবার মারবে না তো।

চোখ পিটপিট করতে করতে বাবার দিকে তাকাল। বাবাও সে-সময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। ভুলু কামরার চারপাশে দেখল এবং অবাক হল খুব। কোথায় গেল মিঃ গোরে ? নিম্মোকে নিয়ে উবে গেল নাকি ? কামরার মধ্যে ডাকাত এবং ডাকাতির কোনো চিহ্নই নেই ! এতক্ষণ কি বই পড়তে পড়তে স্বপ্ন দেখছিল ? ও ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি ? আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে বোকার মতো হেসে উঠল হো-হো করে।

বাবা ভুলুর দিকে তাকালেন। বই পড়তে পড়তে অভ্যেসমতো ভুলু হাসছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ? ফেলুদা খুব জমিয়েছে বুঝি ?"

ঠিক তখনই কামরার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। গোটা-আষ্টেক যুবক ভোজালি আর রিভলভার হাতে চলন্ত ট্রেনের দরজা দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকছে।

ডাকাতগুলোর প্রত্যেকের মুখে কালো কাপড় বাঁধা। চেহারা সাধারণ। যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা সোনা-দানা যা পাচ্ছিল, ছিনিয়ে নিচ্ছিল। কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করছিল না। ভয়ে জড়সড় সবাই। যেন জীবন্ত স্ট্যাচু !

ভুলুর হাত থেকে ফেলুদার বইটাও কেড়ে নিল। ভুলু বোবার মতো স্পিকটি নট।

ডাকাতরা যথাসর্বস্ব লুটেপুটে চম্পট দেবার পর ছুটোছুটি আর কান্নাকাটি শুরু হল কামরার মধ্যে।

চুপচাপ বসে ছিল ভুলু। মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল একটাই কথা। ভুটানি সোয়েটারটা গায়ে পরলেই মাঝেমধ্যে ওর কল্পনাশক্তির অদ্ভুত পরিবর্তন হয়। সোয়েটারটা তখন যেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হয়ে ওঠে।

বাবার সেই দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে যাওয়া, আর আজকের ট্রেন-ডাকাতি যেন একটা সুতোয় বাঁধা। দুটো ঘটনাই বাস্তবে ঘটার আগে চোখের সামনে কেমন ছবির মতো ফুটে উঠেছিল ! আর দু'বারই গায়ে পরা ছিল সোয়েটারটা। কেমন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে সোয়েটারটা। চেপে ধরে গায়ের সঙ্গে। বুকের ওপরে মনে হয় একরাশ বোঝা। গায়ে কে যেন নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকে। তখন আর গায়ে রাখা যায় না ওটাকে। খুলে ফেলতে হয়।

বাড়ি ফিরে সত্যি ট্রেন-ডাকাতির গল্প বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠেছিল। তবে সোয়েটার সম্বন্ধে সন্দেহের কথা কাউকে বলেনি। জানে, কেউই বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে আষাঢ়ে।

তবে সেই ট্রেনের ঘটনার পর থেকে ভুটানি সোয়েটারটাকে বাতিলের পর্যায়ে ফেলে রেখেছিল। তা ছাড়া শীতও দুম করে কমে যাওয়াতে মা কিংবা বাবা ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দেওয়া নিয়ে ওকে বিরক্ত করেননি। পুরনো স্লিভলেস সোয়েটারটাই এই শীতে যথেষ্ট ছিল।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় খাবেই। ভুটানি

সোয়েটার গায়ে চাপালে ফের যদি কোনো সাংঘাতিক ঘটনা দেখে ফেলে ? একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগে ওর। ভাল কিছু কেন সোয়েটারটা পরে দেখতে পায় না। যা দেখে, সবই বীভৎস ! ভয়ানক !

শীত চলে যাবে চলে যাবে করেও আবার যেন ফিরে এল হঠাৎ। বোধহয় শেষ কামড় দেবে বলে। সেদিন রাতে একটু জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল। মায়ের হুকুমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফের গায়ে চাপাতে হল সোয়েটারটা।

বাবার কাছে বসে ইতিহাস পড়ছিল ভুলু। আদিম মানুষেরা কী ভাবে প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখল। কয়েক লাইন পড়েছে কি পড়েনি হঠাৎ লোডশেডিং। একরাশ কালো অন্ধকার ঢেকে গেল ঘরটায়।

"আমরাও যেন আবার সেই আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি," বাবা অন্ধকারের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "শীতকালেও পাওয়ারকাট ?"

মা হারিকেন রেখে গেলেন টেবিলের ওপরে। হাসতে হাসতে বললেন, "ভাগ্যিস আগুন আবিষ্কার হয়েছিল !"

মায়ের কথায় হেসে ফেলল ভুলু। তারপর ফের পড়তে শুরু করল। কাঠে-কাঠে কিংবা পাথরে-পাথরে ঘষে কীভাবে আগুন জ্বালাত আদিম মানুষরা। আগে যারা কাঁচা মাংস খেত, আগুন আবিষ্কারের পর সেই মাংস তারা পুড়িয়ে খেতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, গুহার মধ্যে মাটিতে গর্ত করে জন্তু-জানোয়ারের চর্বি ভরে, সেই চর্বিতে আগুন জ্বালিয়ে গুহা আলোকিত করত তারা।

টেবিলের ওপরে হারিকেনটা দপদপ করছিল মাঝে-মাঝে। ভুলু হারিকেনের দিকে তাকাল। পলতেটা একটু বাঁকা ছিল বলে কালো ভুষো পড়ছিল চিমনিতে। লম্বা একটা ধোঁয়ার রেখা এঁকেবেঁকে উঠছিল ওপরের দিকে।

হারিকেনের আলোর দিকে ভুলুর দৃষ্টি স্থির। চোখের মণিদুটো কেমন যেন ঘোলাটে। হঠাৎ ভয়ে কাঁপতে শুরু করল ও। দেখতে পেল, ওর গায়ে আগুন লেগেছে। সোয়েটারটা পুড়ে যাচ্ছে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে সোয়েটার থেকে। সেই ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল ঘরের ভেতরটা। পরক্ষণেই দেখল, শুধু সোয়েটার নয়, ঘরের চারপাশেই লকলকে আগুনের শিখা।

আতঙ্কে বই ফেলে লাফিয়ে উঠল ভুলু, "আগুন ! আগুন !" সোয়েটারটা খোলার জন্য টানাটানি শুরু করল। ঠিক আগের মতো সোয়েটার তখন কিছুতেই খুলতে পারছিল না। বাবা মুখ নিচু করে কী একটা বই পড়ছিলেন। ওর দিকে অতটা খেয়াল করেননি। পরে যখন লক্ষ করলেন, তখন ও সোয়েটারটা খুলে ফেলতে পেরেছে।

জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, সোয়েটার খুললে কেন ?"

চোখ দুটো বড়-বড় করে ভুলু বলল, "আগুন ! দেখছ না, আগুন জ্বলছে !"

"কই ? কোথায় ?" বাবা এদিক-ওদিক দেখলেন।

ভুলু ইতিমধ্যে সোয়েটার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

"কোথায় আগুন ?" ভুলু মিথ্যে কথা বলছে দেখে বাবা ধমকে উঠলেন, "স্বপ্ন দেখছিলে নাকি ?"

এদিকে সোয়েটার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াতে হারিকেনটা টেবিলের ওপর থেকে নীচে পড়ে গেল সোয়েটারসমেত। ঝনঝন করে একটা শব্দ হল শুধু। তারপরই হারিকেনের পলতের আগুনে দপ করে জ্বলে উঠল সোয়েটারটা।

চোখের পলক পড়তে না পড়তে ঘরের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে বাবা ছুটোছুটি শুরু করলেন। ভুটানি সোয়েটারটা যেখানে জ্বলছিল, তার পাশেই ছিল কাপড়জামা রাখার আলনা। আলনার লাগোয়া বাক্স-পেঁটরা। বইয়ের র‍্যাক।

ভুলু হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত সোয়েটারের দিকে। সোয়েটারটা তাহলে গায়ে-পরা অবস্থায় জ্বলেনি। এইমাত্র হারিকেন ভেঙে জ্বলল।

মা ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছিলেন। বাবা জল নিয়ে এলেন বালতি করে।

আগুন ততক্ষণে ছড়িয়ে গেছে অনেকটা। আলনার জামাকাপড় পুড়ে ছাই। এমনকী বইয়ের র‍্যাকটাকেও বাদ দেয়নি।

ইতিমধ্যে পাড়ার লোকও জুটে গিয়েছিল অনেক। সকলের মিলিত চেষ্টায় আগুন নিবতে বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেল অনেক। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য যে ভুলুই দায়ী, সে-কথা ভেবে অনুশোচনা হচ্ছিল খুব। তবে ভুটানি সোয়েটারটা পুড়ে যাওয়ার জন্য ওর মনে কোনো দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু বাবার দামি-দামি বইগুলোর জন্য।

আগুন নিবে যেতে বাবা-মা দুজনে পাশের ঘরে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ভুলুও ওঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিল। কিন্তু, কতক্ষণ আর মনমরা হয়ে থাকবে। অগত্যা টর্চ হাতে করে গুটি-গুটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে।

যে ঘরে আগুন লেগেছিল, সেই ঘরের অবস্থা তখন ভয়াবহ। ভুলু ভয়ে ভয়ে ঢুকল সেখানে। টর্চের আলোয়, ভেতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। পড়ার টেবিলটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল।

ভুলু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে। ঘরের বাতাসে বিশ্রী একটা চামড়া-পোড়া গন্ধ। ঠিক শ্মশানের মতো। চোখ দুটো জ্বালা করছিল ওর। মাঝে মাঝে কাসছিল খুক-খুক করে। ভাবছিল, ভুটানি সোয়েটারের অলৌকিক শক্তির কথা। তিন-তিনবার যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেল।

টেবিলের নীচে সোয়েটারটা যেখানে দাউদাউ করে পুড়ে গিয়েছিল, সেখানে টর্চের আলো ফেলতেই গা শিরশির করে উঠল। নিমেষে খাড়া হয়ে উঠল প্রত্যেকটা রোমকূপ। অবাক বিস্ময়ে দেখল, চিমনি-ভাঙা হারিকেনের পাশে একটা অবাঞ্ছিত বস্তু ! একটা বেড়ালের পোড়া মৃতদেহ।

বিড়বিড় করে উঠল ভুলু, "ইশ্, বেড়ালটা এখানে পুড়ল কী করে ? আগুন লাগার সময় ভেতরে ঢুকে পড়েছিল নাকি ! হঠাৎ কোত্থেকে এল বেড়ালটা ! আগে তো কখনো দেখিনি !"

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেইদিকে এবং তখনই ভুল ভাঙল ওর। বেড়ালটা সত্যিকারের নয়। পুড়ে যাওয়া সোয়েটারের ছাইয়ের আকৃতিটাই অবিকল একটা বেড়ালের মতো দেখাচ্ছিল ! যেন মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা মরা বেড়াল। পুড়ে কুচকুচে কালো হয়ে গেছে।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

মানুষবলির জঙ্গলে

শৈলেন ঘোষ

একদিকে পাহাড়। পাহাড় ঘিরে ঘন জঙ্গল। আর এই জঙ্গলের গায়ে, কিছুটা দূরে, এক ভয়াল সমুদ্র। এই জঙ্গলের দেশে থাকত টুহো নামে একটি ছোট্ট ছেলে। এখন টুহোদের এই জঙ্গলে দুর্ভিক্ষের বিপদ। বৃষ্টি নেই। পাহাড়ের ঢালুতে অথবা এধার ওধার ফসলের জমিতে ছিটেফোঁটা যে-টুকু চাষ-আবাদ হয়, সে-সব এখন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কত মানুষের প্রাণ গেছে। টুহোরা অবশ্য এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে, টুহোর মা আর বাবা। আর বেঁচে আছে টুহোর বন্ধু লুলাম। লুলাম থাকে টুহোদেরই কাছে। কারণ, ক-বছর আগে সমুদ্রে ঢেউ তুলে সেই যে জলদস্যুর দল লুঠপাট করতে এসেছিল, তারা ধরে নিয়ে গেছে লুলামের মা-বাবাকে। শুধু লুলামের মা-বাবা কেন, আরও কতজনকে যে জাহাজে বন্দী করে নিয়ে গেছে, তারও হিসাব কেউ জানে না। কী ভয়ংকর এই বিদেশী জলদস্যুরা। মাথার চুলগুলো যেমন লালচে, গায়ের রঙও তেমনি টকটকে লাল। হাতে বর্শা, সঙ্গে কামান আর নয়তো চকচকে তরোয়াল। আরও আছে, ভয়ংকর হিংস্র কুকুর। ওই দস্যুদের তুমি আঘাত করতে যাও, এই কুকুর তোমার টুঁটি কামড়ে ধরে তোমায় শেষ করে ফেলবে। কত মানুষের যে শুধু কুকুরের কামড়েই প্রাণ গেছে, সে-কথা শুনলেও তোমার হাত-পা থরথর করে কাঁপবে!

টুহোরা জঙ্গলের মানুষ। সুতরাং তাদের পোশাক, চালচলন তো আর আমাদের মতো নয়। তুমি ওদের দেখলে ভাবতেই পারো, কী অসভ্য রে বাবা! ওই জলদস্যুদের মতো তাদের না আছে অস্ত্র, না আছে কুকুর। ওদের সম্বল শুধু তীর আর ধনুক। তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে ওরা শিকার করে, নয়তো, শত্রুকে ঘায়েল করে। কিন্তু জলদস্যুর ওই কামানের পাশে এই তীর-ধনুক তুচ্ছ খেলনা। তাই সামান্য ক'জন দস্যু হঠাৎ চড়াও হয়ে সহজেই একদল মানুষকে কুপোকাত করে তাদের সম্বল নিয়ে চম্পট দিতে পারে। সম্পদ নিয়ে চম্পট দিক, তবু তার একটা মানে আছে। কিন্তু কেন যে তারা মানুষ ধরে নিয়ে যায়, এর মানে বুঝতে পারে না টুহো। কেননা, সেই বোঝার বুদ্ধি তার এখনও হয়নি। হয়নি তার সেই বয়স। কারণ, এখন তার বয়স মাত্র নয়। পরে অবশ্য টুহো শুনেছে, এই জলদস্যুরা মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় অন্যের কাছে। তাদের নাম হয় ক্রীতদাস। অন্য দেশে, অন্যের হুকুমে খেটে মরে

ছবি : দেবাশিস দেব

তারা, তার বদলে তাদের জোটে দু-বেলা দুটি অন্ন। কে জানে, হয়তো লুলামের মা-বাবাকেও এমনই দাসত্ব করে দিন কাটাতে হচ্ছে।

সত্যি বলতে কী, এই জঙ্গলের মানুষের বিপদের শেষ নেই। যেমন বিপদ জলদস্যুদের জন্য, তেমনি বিপদ বৃষ্টি না হলে। আবার আর এক বিপদ ঝড়। যখন দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়, তখন সে যে কী সাংঘাতিক ঘটনা! সমুদ্রের কাছাকাছি বলে, এই জঙ্গলে ঘূর্ণিঝড়ের দানবটা যখন ধেয়ে আসে, তখন আর রক্ষে থাকে না। নীল আকাশের বুকে ধুলোর জাল ছড়িয়ে আর কালো মেঘের গুরুগুরু গর্জনে ঝড়ের সে কী প্রচণ্ড দাপাদাপি! ঝড়ের সামনে যা পড়বে নির্ঘাত নিশ্চিহ্ন। ঘরবাড়ি, গাছপালা খেলনা-পুতুলের মতো মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে। তার ওপর যদি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস উছলে ডাঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন আর কথা নেই। অসংখ্য মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জলের তলায়। সে যে কী ভয়ংকর দৃশ্য, না-দেখলে কে বোঝাবে!

টুহোরা শিখেছে, এ-বিপদ হল, মানুষের পাপের ফল। এই পাপের ফলে দেবতা ক্ষিপ্ত হয়ে মানুষকে দেন এই সব শাস্তি। সুতরাং দেবতাদের তুষ্ট করতে না পারলে ধ্বংস নিশ্চিত। দেবতা থাকলে পুজো-আর্চা করার জন্যে পুরোহিতও থাকবেন, থাকবেন জ্ঞানী-পণ্ডিতজন। তাই, না বললেও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, এ-সব কথা তাঁরাই শিখিয়েছেন। তাঁরা এ-ও শিখিয়েছেন, এ-পাপ থেকে নিস্তার পেতে হলে কী করতে হবে এই জঙ্গলের মানুষকে। তাঁদেরই আদেশে, প্রতি বছর কত মানুষকে যে দেবতার সামনে বলি দেওয়া হয়, সে-কথা শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠবে। ওঁরা বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন, মানুষের রক্ত পেলেই তুষ্ট হবেন দেবতা, আর জঙ্গলের মানুষজন বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। এ-বিশ্বাস কার সাধ্য ওদের মন থেকে মুছে দেয়! তাই টুহোদের জঙ্গলে মানুষের প্রাণ, সে তো চাইলেই পাওয়া যায়! যেন কোনো দামই নেই!

কিন্তু ওই ছোট্ট টুহোর মন যেন মানতে চায় না এ-বিশ্বাস। তাই যখনই কোনো মানুষের মৃত্যুর আগে কান্নার শব্দটা ওর কানে পৌঁছায়, তখন ওর মন বলে, এ কী অন্যায়, নিষ্ঠুর অত্যাচার মানুষের ওপর! কিন্তু এ-কথা তো মুখ ফুটে বলা

"সংসারে অনেক দেখেশুনে
কাজ করাতে হয় ভাই...
সেই জন্যে এ বছর দেয়ালে
ট্র্যাক্টর লাগিয়েছি!"
"আমার 'উঁনি' আবার একটু নতুন ধরণের মানুষ তো—পাড়ার মধ্যে সবপ্রথম আমাদের বাড়ীতেই রেডিও এসেছিল··· ভাবলাম এবার দেয়ালে আবার সেই আদ্যিকালের পাউডার ডিস্টেম্পার লাগাবো কেন? এবার ট্র্যাক্টর ডিস্টেম্পার লাগিয়েছি··· দারুণ দেখাচ্ছে!"

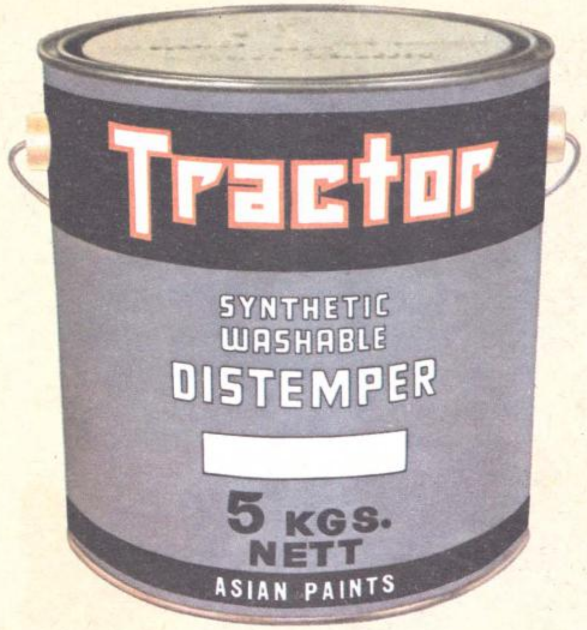

"দেখতে দারুণ সুন্দর হয়, আর রীতিমত সাশ্রয়! যাকে বলে সর্বদিক থেকে লাভের সওদা। এবার আপনি নিজেই ব্যবহার করে দেখুন:"

ট্র্যাক্টর সিন্থেটিক ওয়াশেব্‌ল্ ডিস্টেম্পার

১. লাগানোর কাজ পরিচ্ছন্ন আর সহজ হয়, কারণ ফ্যাক্টরী থেকে তৈরী পাওয়া যায়, কোনো দুর্গন্ধও নেই।
২. চমৎকার মখমলী ফিনিশ, অসমান দাগ পড়ে না, সমান রঙ হয়।
৩. চটপট শুকোয়, ঝটপট তুলির কাজ সারা যায়।
৪. দাগ-ছোপ ভিজে কাপড় দিয়ে মুছলেই একেবারে সাফ!
৫. ঘেঁষে বসলেও রঙ ঝরে কাপড়ে লাগে না।
৬. বহু রকমের রঙ—স্টেনার মিশিয়ে হাজার রকমের রঙ তৈরী হয়।
৭. বেশী টেঁকে—বহু বছর নতুনের মত থাকে।
৮. দাম সামান্য বেশী, তবে বেশী দিন টেঁকে বলে শেষ পর্য্যন্ত সাশ্রয় হয়।

সাধারণ পাউডার ডিস্টেম্পার

১. লাগানোর কাজ অপরিচ্ছন্ন, আর সহজ নয়, কারণ নিজে মেশাতে হয়।
২. বাজে খরখরে ফিনিশ, দেয়ালে ব্রাশের দাগ—রঙ কোথাও বেশী কোথাও কম, উঠে গিয়ে দেয়ালের রঙ বিগড়ে দেয়।
৩. দেরীতে শুকোয়, তুলির কাজ সারতে অনেক সময় নষ্ট হয়।
৪. দাগ-ছোপ সাফ করা যায় না।
৫. রঙ ঝরে উঠে গিয়ে কাপড়ে লাগে।
৬. অল্প রঙ, স্টেনার মিশিয়ে মনের মত রঙ বানিয়ে নেবার সুবিধে নেই।
৭. কিছু মাসের মধ্যেই ফিকে আর ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায়।
৮. দাম কম, তবে কম টেঁকে বলে শেষ পর্য্যন্ত ব্যয়বহুল।

এবার নতুন ঢং, নতুন রঙ ব্যবহার করুন, ট্র্যাক্টর লাগিয়ে দেয়াল সুন্দর করে তুলুন!

ট্র্যাক্টর

বহু বছর ধরে কোটি কোটি লোক ব্যবহার করে আসছেন। ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ডিস্টেম্পার।

এশিয়ান পেন্টস্

যায় না। মরতে কে চায়! টুহো জানে, এ-কথা যে বলে, তার প্রাণটিকে কেড়ে নিতে ওদের হাতের ধারালো অস্ত্র মুহূর্ত দেরি করবে না। ওদের বিশ্বাস এমনই অন্ধ! সুতরাং টুহো চুপচাপ দেখে যায়, আর শোনে।

কিন্তু একদিন টুহো পারল না নিশ্চুপ থাকতে। একদিন মরণের ভয়টা টুহোর মন থেকে উবে গেল। সে যেন রুখে দাঁড়াতে চায়। কেননা, তার বন্ধু লুলামকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। হ্যাঁ, এই দুর্ভিক্ষ, এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে লুলামকে বলি দেবে ওরা কাল সকালে বৃষ্টির দেবতার কাছে!

আজ তাই এই অন্ধকার ঘুমের রাতে টুহোর চোখে ঘুম নেই। সে বিছানা ছেড়ে কখনও উঠছে, কখনও ছটফট করছে, কখনও ভাবছে তার বন্ধু লুলামের কথা। ভাবছে, কেন এমন হয়! তার ওই ছোট্ট বন্ধুটিকে হত্যা করতে কারো কি হাত কাঁপবে না! কেউ কি বলবে না, ও নিষ্পাপ। পাপ বলে কথাটার যদি কোনো মানে থাকে, তবে, সে-পাপ তো সবাই করেছে, তবেই না এ দুর্ভিক্ষ! লুলামের একা কী দোষ যে, বেছে বেছে তাকেই হত্যা করা হবে! লুলামের মিষ্টি মুখখানি বারবার টুহোর ঘুম-ভাঙা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। স্থির থাকতে পারে না টুহো। ছুটে যায় টুহো এই মাটির ঘরের ছোট্ট জানালাটার সামনে। আকাশের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকে। আকাশের ওই তারাগুলি দেখতে-দেখতে টুহোর চোখদুটিও যেন অজান্তে দেখতে পেয়েছিল, তার বন্ধুরও সেই চোখদুটি। দেখতে পেয়েছিল, সে-চোখে লুলামের অশ্রুর ফোঁটাগুলি টলমল করছে যেন! থাকতে পারেনি টুহো। ওই আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই জানালার ফাঁক দিয়ে। টুহোর ওই দুটি হাত একটুকরো মেঘ আর ক'ফোঁটা বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু চায় না ওই আকাশের কাছে। কারণ এ-বৃষ্টি যে তার বন্ধুর প্রাণ। বৃষ্টি হলে হয়তো বা ওদের অস্ত্রের আঘাতে লুলামের রক্ত ঝরবে না। ও বেঁচে যাবে।

কিন্তু কই মেঘ? আকাশ-ভর্তি ওই অসংখ্য তারা যেন চোখ মটকে ঠাট্টা করছে টুহোকে। যেন বলতে চাইছে, "আজকের রাতটুকুই তোমার বন্ধুর শেষ রাত। কাল ভোরেই আলো দেখতে ভুলবে তোমার বন্ধুর চোখদুটি। সে তোমার নাম ধরে আর ডাকবে না। কিংবা এই জঙ্গলের গা বেয়ে পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে সে ছুটে যাবে না খেলা করতে।"

হ্যাঁ, এই পাহাড়েই ছুটে-ছুটে খেলা করত টুহো আর লুলাম। এই গা-ছমছম গভীর জঙ্গলেই লুকিয়ে-লুকিয়ে সাপ ধরে ওরা কিংবা গিরগিটি অথবা বুনো খরগোশ। মাঝে-মাঝে চিতাবাঘের মতো দেখতে জাগুয়ারের মুখোমুখি যে ওরা হয়নি, তেমন না। একবার তো প্রায় মরতেই বসেছিল। সেবার ওরা দু'জনেই যাচ্ছিল একটা আনন্দ-উৎসব দেখতে। সেটা ছিল জংলি-নাচের উৎসব। এমন উৎসব তো প্রায় লেগেই থাকে এই জঙ্গলে। সে-নাচে বড়রা যেমন মেতে ওঠে, তেমনি ছোটরাও। এ-নাচ দেখতে অনেকখানি পথ যেতে হবে বন পেরিয়ে। ওদের সঙ্গে বড় কেউ না থাকলেও, দু'জনের কাঁধেই ছিল তীর-ধনুক। ওরা জানে, বনের গভীরে ওদের পা যতই এগিয়ে যাবে, ততই বন হয়ে উঠবে ভয়ংকর। কী অদ্ভুত সেই গহন বনের রূপ! সে-রূপ দেখলে, বনের যারা বাসিন্দা তাদেরও কাঁটা দেয় গায়ে! সুতরাং টুহো আর লুলামের গা এখানে এলে যদি ছমছমিয়ে ওঠে, তবে ওদের দোষ দেওয়া যায় না।

অবিশ্যি এই ঘন জঙ্গলের মধ্যেই আবার এমন-এমন দৃশ্য নজরে পড়বে যে, দেখলে, চোখ জুড়িয়ে যায়। সে-দৃশ্য দেখলে মনে হবে, এখানেই যদি একটা ছোট্ট ঘর বেঁধে চিরকাল থাকা যেত! বনের গায়ে পাহাড়ের ঢালু পথ। ঢালুর নীচে একটা মস্ত সরোবর। চারদিকে গাছের গায়ে গাছ, ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ছে, নয়তো খেলা করছে। থমকে-থমকে হাওয়ার শব্দ। পাতার হাততালি। দেখতে-দেখতে বিভোর হয়ে যাবে। তোমার মুখের শব্দগুলি যেন হারিয়ে যায়। তুমি নিশ্চুপ হয়ে অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকবে খালি! না, কোনো শব্দ না, কোনো কথা নয়! কথার শব্দে যদি ওই পাখিরা উড়ে পালায়, কিংবা গাছেরা যদি পাতায়-পাতায় তালি না-বাজায়! অথবা সরোবরের জলে বাতাসের যে মৃদু-মৃদু হিল্লোল ঝিলমিল করছে তা যদি থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে! না থাক, কথা না-বলাই ভাল।

সেইদিন টুহো আর লুলাম এই পথ দিয়েই নাচ দেখতে যাচ্ছিল। যদিও দু'জনের মুখে হাজারো গল্প, তবু তাদের চোখ কিন্তু সজাগ। এই জঙ্গলে কোথায় কী বিপদ ওত পেতে আছে, কে বলতে পারে! জাগুয়ারকে তো আর বিশ্বাস নেই! উরিব্বাস! যেমন বাছাধন সড়সড় করে গাছে উঠতে পারে, তেমনি পারে তরতর করে সাঁতার কাটতে। তার ওপর গায়ে এমন ছোপ, পাতা-ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। জাগুয়ার খেপে গেলে রক্ষে নেই। সামনে পড়লেই হয়, নির্ঘাত মরণ। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষকে মারলেও মানুষের মাংস ওরা মুখেও তোলে না।

সেদিন হাঁটতে-হাঁটতে একটা মজার দৃশ্য দেখে দু'জনেই থমকে দাঁড়ায়। দেখে কী, কটা 'হাউ-হাউ' বাঁদর গাছের ডালে লেজ জড়িয়ে আর একটা ডালে হাত পাকিয়ে দোল খাচ্ছে। সত্যি, এই 'হাউ-হাউ' বাঁদর দেখলে তুমি না-হেসে থাকতেই পারবে না। এমন উদ্ভট দেখতে বাঁদরগুলোকে! লেজটা তো ইয়া পেল্লায় বটেই, তার ওপর গলার নীচে এইসা ঢ্যাপসা মাংসের একটা ফাঁপা ঢিপি! দেখলে, হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। এঁরা উঠবেন সেই সাতসকালে, যখন কারো ঘুম ভাঙবে না। উঠেই 'হাউ-হাউ' করে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দেবে যে, ঘুমোয় কার সাধ্যি। আবার মা-বাঁদরগুলো তো প্রায় কুকুরের মতোই ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচাবে। ওই 'হাউ-হাউ' করে চেঁচায় বলেই ওদের নামও হয়ে গেছে 'হাউ-হাউ'।

বাঁদরগুলো গাছের ডালে অমন করে দুলতে-দুলতে যেই টুহো আর লুলামকে দেখতে পেয়েছে, আর দোলা! ব্যস! সটাসট মার ছুট! এমনিতে বাঁদরগুলো একটু গদাইলশকর! কিন্তু অচেনা কাউকে দেখলে হয়, টপাটপ মারবে লাফ! মেরেই ভোঁ কাট!

বাঁদর দেখলে আর লুলামকে পায় কে! কী চেঁচান চেঁচাবে, আর তাড়া করবে। যতই হাত ধরে টানো আর থামতে বলো, মানবেই না। তবু বন বলে কথা! বিপদে পড়তে কতক্ষণ! কিন্তু বাঁদর দেখে লুলামের সে-সব এখন কিচ্ছু মনে নেই। সুতরাং সে কখনও হাততালি দিচ্ছে, কখনও বাঁদরের মতোই হাউ-হাউ করছে আর টুহো যতই তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে

ততই সে—

বলতে-বলতেই চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে লুলাম। টুহো থতমত খেয়ে গেছে ! কী ব্যাপার ! ব্যাপার আর কী, সামনে সাক্ষাৎ যমদূত ! একটু দূরে, বনের গায়ে পাহাড়টা যেদিকে বাঁক খেয়েছে, সেখানে একটা জল-চিকচিক সরোবর ! সরোবরের জলের ওপর একটা গাছের ডাল নেমে এসে প্রায় জল ছুঁই-ছুঁই করছে। ডালটা দেখলেই বুঝবে বেশ শক্ত। সেই ডালের ওপর বসে-বসে এক বাছাধন জাগুয়ার দিব্যি মাছ ধরছে। বাছাধন করছে কী, জলের ভেতর লেজ ডুবিয়ে লেজের ডগা টুকটুক করে নাচাচ্ছে। মতলবটা কী জানো ? ওরা জানে এমনি করে টুকটুকিয়ে লেজ নাড়লে জলের মাছ ধাঁধায় পড়ে যাবে। ভাববে বুঝি পোকামাকড়, খাবারদাবার। ভেবে, লোভে-লোভে যেই লেজের চারপাশে এসে ছুক ছুক করবে, অমনি সেই রামচালাক জাগুয়ার জলের মধ্যে মারবে লাফ ! মেরেই খলাত করে কামড়ে ধরে মাছের মুণ্ডু চিবুতে শুরু করে দেবে। উঃ ! কী শয়তান রে বাবা !

কিন্তু এখন ? মাছধরা তার হল না ! কেন ? ওই 'হাউ-হাউ' বাঁদরের লাফালাফি আর লুলামের চেঁচামেচি শুনে তার পিলে শুকিয়ে গেছে ! জলের থেকে লেজ না-তুলেই, গাছের ডালে ঝটপট দাঁড়িয়ে পড়েছে। পড়তেই চোখাচোখি ! আর দেখতে, বনের সেই জাগুয়ারের লালচক্ষু কটমটিয়ে উঠল ! ওদের দিকে তাকিয়ে লেজ দোলাতে লাগল ! উরিব্বাস, সে কী মূর্তি ! তাই না দেখে, টুহো লুলামের হাত ধরে দে-ছুট ! পালা, পালা ! কিন্তু পালাবে কোথায় ! জাগুয়ারটা মেরেছে লাফ ! এই সেরেছে ! আর কিছু না-পেয়ে টুহো লুলামকে নিয়ে সামনের ঝোপটার মধ্যেই দুড়দাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে। বনের মধ্যে এ কি আর যে-সে ঝোপ ! কী ঘন দেখেছ ! জাগুয়ারটা তো তেমনি ধূর্ত। জানে ঝোপের মধ্যে ঢুকলে যদি ঝোপের জালে জড়িয়ে যায়। তাই ঝোপের মধ্যে না-ঢুকে গাছের ডালে মারল লাফ ! লাফ মেরে ওপর থেকে টুহোদের দেখতে লাগল। উফ ! গোঁফদুটো দেখো, রাগে যেন ফুলে-ফুলে উঠছে !

কী বিপদেই না পড়ল টুহো আর লুলাম। না পারে এগোতে, না পিছুতে। অথচ ঝোপের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু এখন যে কী করা উচিত, দুজনে ভেবেও পাচ্ছে না। ভয়ে দুজনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জাগুয়ারটা হঠাৎ করল কী, এই ডাল থেকে মারল ওই ডালে এক লাফ ! মানে, টুহো আর লুলামের একেবারে মাথার ওপর। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ঘাড়ে ! চোখের পলকে টুহো লুলামের হাতটা ধরে মেরেছে এক টান। মারতেই, দু'জনেই ঝোপের মধ্যে হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে চিতপটাং ! কিন্তু জাগুয়ারটাও তো সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়েছে ! দিলে কী হবে ! তার টিপ গেছে ফশকে ! সে ওদের ঘাড়ে না-পড়ে, পড়ল গিয়ে কাঁটা-ঝোপে। পড়েই লতাপাতায় এমন জড়ান জড়াল যে, বাছাধনের কম্ম শেষ ! না-পারে ছাড়াতে, না-পারে গড়াতে। ঝটাপটি আর সে কী হম্বিতম্বি ! যতই করছে হম্বিতম্বি ততই মরছে ঝোপের জটে জড়িয়ে ! এই দৃশ্যের কথা ভাবো তো একবার ! একটা ঘন ঝোপের একদিকে দুটি ছেলে প্রাণের দায়ে আঁকপাঁক করছে, আর সেই ঝোপেরই দু হাত দূরে একটা জাগুয়ার

এখন!
প্রাকৃতিক গুণে ভরপুর
ভিক্স
হার্বল
বড়ি
VICKS
Herbal
Throat Drops
এখন ভিক্স-এর নিজস্ব ঔষধি এবং প্রাকৃতিক ভেষজের এমনভাবে সমন্বয়সাধন হয়েছে যে গলার-কষ্টে তাড়াতাড়ি আরাম আনে। মুখে আনে এক অনন্য স্বাদ।
গলার পক্ষে উপকারী
স্বাদেও অনন্য!

OBM/1656 BN/R

তাদের মারবে বলে হাঁকডাক করছে ! উঃ ! শিউরে উঠতে হয় !

কিন্তু অবাক করে দিল লুলাম। টুহো যা ভাবতে পারেনি লুলাম তাই করে বসল। করল কী, ফশ করে ধনুকটা কাঁধ থেকে টেনে নিয়ে দিল ছুড়ে একটা বিষমাখা তীর ! ব্যস ! সেটা প্যাঁট করে জাগুয়ারের পেটে গেল বিঁধে ! তারপর সে কী দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ! এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বাছাধন জাগুয়ার, মনে হল, এই বুঝি ঝোপের প্যাঁচ ছাড়িয়ে টুহো আর লুলামের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ! কিন্তু এমন মোক্ষম প্যাঁচে জড়িয়েছে সেই জাগুয়ার যে যতই সে ধামসাচ্ছে, ততই ফাঁদের ফাঁপরে আটকা পড়ছে। কিন্তু ওই তীরের বিষ তো সাংঘাতিক। কতক্ষণ আর লম্ফঝম্ফ করবে সে ! দেখতে-দেখতে কেমন যেন থিতিয়ে আসছে তার শক্তি। একটু পরেই ভবলীলা তার শেষ হবে !

জাগুয়ারটার সময় ঘনিয়ে এসেছে দেখেও কিন্তু টুহো আর লুলাম সেখানে দাঁড়াল না। ওরা জানে, এক্ষুনি না-পালালে আরও বিপদ ঘটতে পারে ! সুতরাং সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই জাগুয়ারের মরণের শেষ দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না তারা। ঝোপের কাঁটাকাঠি আর লতাপাতার জট ছাড়াবার জন্যে দু'জনেই টানামানি লাগিয়ে দিলে। শেষমেশ রক্ষে পেল বটে, কিন্তু ভয় গেল না। সেখান থেকে দু'জনে মারল ছুট একেবারে চোখ-কান বুজে ! অবিশ্যি গহন বনে চোখ-কান বুজে ছুটব বললেই তো ছোটা যায় না ! পদে পদে বাধা। পাহাড়ের ঢালুর ওপর চাঁই-চাঁই পাথর তো তোমার মস্ত শত্রু ! তোমায় যেমন গাছের এ-ফাঁক ও-ফাঁক দিয়ে ছুটতে-ছুটতে হোঁচট খেতে হবে, তেমনি গাছের এপাশে ওপাশে ছড়ানো পাথরে ঠোক্করও সামলাতে হবে। এছাড়াও কে বলতে পারে, কোথায় সাপখোপটা ঝাপটা মারার জন্যে ফণা তুলে ফুঁসছে ! সুতরাং বললেই চোখ-কান বুজে ছোটা যায় না বনের ভেতর। এ-কথা কে না জানে, পালাতে পারেনি বলেই না লুলামের মা আর বাবা ধরা পড়েছিল জলদস্যুদের হাতে এই বনেরই ভেতর ! সেও তো এক ভয়ংকর ঘটনা ! কী সে ঘটনা ?

সেদিন লুলামের মা আর বাবা বনে গিয়েছিল শিকারের খোঁজে। ওই থমকে থেমে থাকা বনের ভেতর ওরা চুপিসারে খুঁজে বেড়াচ্ছিল হরিণ। ওরা খেয়ালই করেনি, ওদের পেছনেও নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে জলদস্যুর ভয়ংকর হাতের থাবা ! কে জানে, কখন ওই দস্যুরা এখানে ঢুকে গা-ঢাকা দিয়ে বসে ছিল। লুলামের মা হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল একটা বুনো শুয়োর। নাই-বা হল হরিণ, বুনো শুয়োরেরই পেছনে তাড়া লাগালে। লুলামের বাবার হাত থেকে পলকে তীর ছুটল। একেবারে শুয়োরের গায়ে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল লুলামের মা আর বাবা। কিন্তু অতর্কিতে তাদের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলদস্যুর দল। লুলামের বাবার হাতের তীর শত্রুর দিকে ছিটকে আসার আগেই, ওরা জাপটে ধরল। ওদের হাতে-পায়ে শিকল বাঁধল। এই জঙ্গল আর ওই পাহাড়ের পাথর পেরিয়ে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে। কেউ জানতেও পারল না।

সেই থেকে লুলাম মা-বাবাকে হারিয়ে টুহোদেরই কাছে, তাদের আপনজন হয়ে আছে। টুহোর সে বন্ধু, কিন্তু টুহোর মা আর বাবার কাছে সে-ও যেন টুহোর মতোই তাদের ছেলে। অথচ লুলামকে বলি দেবার জন্যে যখন টুহোদের বাড়ি থেকে নিয়ে গেল ওরা, তখন ? তখন সবাই চুপ ! শুধু কেঁদে উঠেছিল টুহো। সে-কান্না তার বুকের মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। তাই সে এই রাতের অন্ধকারে জানালায় মুখ রেখে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে ক'ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে।

কিন্তু হঠাৎ যেন টুহোর বুকটা কান্না ভুলে কেঁপে ওঠে। কেমন যেন ছটফটিয়ে উঠল পায়ের পাতা দুটি। এই বন্ধ ঘরের অন্ধকারে ওর আচমকা মনে হল, বন্ধুর জন্যে এভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করলে তো তার প্রাণ কেউ ফিরিয়ে দেবে না ! টুহো ভাবল, সে কি পারে না লুলামকে বাঁচাতে ! গায়ে কাঁটা দেয় টুহোর। বুকখানা শক্ত করে সে মনে-মনে বলে উঠল, হ্যাঁ সে পারে ! আর যদি না-পারে, তবে বন্ধুর জন্যে মরতে তার ভয় নেই।

টুহো বুক ফুলিয়ে টান-টান হয়ে দাঁড়াল এবার। বাইরের অন্ধকার থেকে ঘরের নিস্তব্ধতায় মুখ ফিরিয়ে দেখল, মা আর বাবা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। নিঃসাড়ে তীর-ধনুকটা পিঠে বাঁধল। খুব সাবধানে ঘরের দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে বাইরে। কোথায়, কোন্‌খানে লুলাম যে এখন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে, সে তার জানা। জায়গাটা এখান থেকে খানিকটা দূরে। বনের এই ঘনজঙ্গলের কোল বেয়ে তাকে উঠতে হবে পাহাড়ের ওপর। সেখান থেকে আরও ওপরে দেবতার মন্দির। সেইখানে আছে লুলাম। সেই মন্দিরের পূজারী সারারাত যে লুলামের দিকে নজর রেখে জেগে থাকবে, এ কি আর টুহোর জানা নেই ! হায় রে, কে জানে এই গভীর রাতে লুলাম এখন কী করছে ! সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে ! নাকি, জেগে-জেগে কাঁদছে ! এই যে বন, এই যে পাহাড় বেয়ে ঝরনার শব্দ, কিংবা সকালের আকাশ-ভাঙা রোদের ছটা, পাখির নাচ, ঝিরিঝিরি বাতাসের ঢেউ-লাগা শিহরন, লুলাম তো আর কোনোদিনই দেখতে পাবে না। আজকের রাত যখন ফুরিয়ে যাবে, ডেকে আনবে কালকের ভোর, যখন হাজার-হাজার মানুষ এই পাহাড়ের ওপরে জমায়েত হয়ে ওর মৃত্যুর মুহূর্তে চিৎকার করে ডেকে বলবে, "বৃষ্টির দেবতা, তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আকাশভেঙে জল দাও," যখন বেজে উঠবে কাড়া-নাকাড়া, তখনই বোধহয় আর্তনাদ করে কেঁদে উঠবে লুলাম। বলবে, "এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি তো কোনো পাপ করিনি। তোমরা করেছ পাপ, আমার কেন রক্ত নেবে ? আমি বাঁচতে চাই।"

হ্যাঁ, টুহো ওকে মরতে দেবে না। টুহো লুলামকে বাঁচাবেই। তাই এই অন্ধকার রাতে সে একা বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে। এই নিস্তব্ধ, নিশুতি রাতে বনের গভীরে কত যে ভয়ংকর বিপদ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, সে তার অজানা নয়। তবু সে-ভয় এখন তার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। এখন টুহোর বুকখানা সাহসে যেন ফুলে উঠছে। সে একা একা যতই বনের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন দুঃসাহসে তার চোখমুখ ঝলসে উঠছে। ঝিঁঝির শব্দ, অথবা ক্ষুধার্ত সাপের নিশ্বাস, কিংবা কোনো শিকারি পশুর আর্তনাদ টুহোকে মাঝে-মাঝে চমকে দিলেও, তার বুকের সাহস কেউ কেড়ে নিতে পারবে না আর। অবিশ্যি সাপ নামক শয়তানটাকেই ভয়। কেননা, কোন ফোকরে যে থাকেন তিনি, বোঝা দায়

তাই টুহোও এই জ্যোৎস্না-ঝরা আলো-আঁধারে বনের পাতার ওপর পায়ের শব্দটাকে, শত্রুকে খেদিয়ে দেবার জন্যে, জোরে-জোরে ঠুকে যাচ্ছে ! অবিশ্যি তাকে তেমন কোনো হিংস্র বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হতে হয়নি এখনও পর্যন্ত । এখন ও পৌঁছে গেছে বনের ধার ঘেঁষে পাহাড়ের পায়ের কাছে । এই পাহাড়ের ওপরেই তাকে উঠতে হবে । ওপরেই সেই মন্দির । সেই মন্দিরেই আছে লুলাম । কিন্তু এই রাতের ছায়ায় পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা, সেও তো এক ভয়াবহ অভিযান । শুধু পাথর নয় । পাথরের গায়ে গায়ে গাছ । গাছের আড়ালে আবার লুকিয়ে আছে খাদের ফাঁদ ! সে ফাঁদ তো মরণ-ফাঁদ । পিছলে পড়লে, লুলামের আগেই টুহোর সব শেষ । সুতরাং চোখের দৃষ্টিটাকে সজাগ রেখে তাকে এগিয়ে যেতে হবে পাহাড়ের ওপর । টুহো মরতে চায় না । মরতে যদি হয় তাকে, সে মরতে রাজি আছে । কিন্তু তার আগে সে লুলামকে বাঁচাবেই । কিন্তু কেমন করে ? বুঝিবা টুহো এর উত্তর নিজেও জানে না ।

বলতে বলতেই এরই মধ্যে অগুনতি পাথর টপকে টপকে পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে সে । এখানে থমকে দাঁড়াল সে ! চমকে চাইল । ঝাপসা অন্ধকারে এখান থেকে টুহো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মন্দিরটা । বুকটা শিউরে উঠল । হ্যাঁ, এবার তাকে আরও সতর্ক হয়ে এগোতে হবে । আরও সাবধানে । কখনও গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়ে, কখনও পাথরের আড়ালে লুকিয়ে-ছাপিয়ে শত্রুর সন্ধানী নজরটা তাকে এড়িয়ে যেতে হবে । কারণ শত্রু যদি জানতে পারে, তবে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ । এমনকী, হয়তো তারও নিস্তার পাওয়ার কোনো পথই খোলা থাকবে না । এখন তাই টুহো কাঁধ থেকে তীর-ধনুকটা নামিয়ে হাতে নিয়েছে । এখন সে পায়ের শব্দটাকে সামলে রাখার জন্যে, আলতো পায়ের ডিঙি মেরে হেঁটে চলেছে । পা যদি ফসকায়, তার ফল যে কী হবে, সে না বললেও, কে না বুঝতে পারে !

ধরো, এমনি করতে-করতে টুহো মন্দিরের কাছাকাছি না-হয় পৌঁছাল, কিন্তু তারপর ? তারপর ঢুকবে কেমন করে মন্দিরের ভেতরে ? ঢোকার পথে, মন্দিরের ফটকে, পাহারা তো কেউ দেবে নিশ্চয়ই ! তখন ? অথচ লুলামকে উদ্ধার করতে তাকে যেমন করে হোক মন্দিরের ভেতরেই যেতে হবে !

এরই ফাঁকে আরও বেশ খানিকটা চড়াই ডিঙিয়ে উঠে এসেছে টুহো । এখন সে সত্যিই মন্দিরের প্রায় সামনাসামনি এসে পড়েছে । মন্দিরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টুহো । এই যে ঘুপচিমতো জায়গাটায় লুকিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল, এখানে আর কাউকে দেখতে হচ্ছে না ! কিন্তু আশ্চর্য ! মন্দিরের আশেপাশেও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না । ভারী নির্জন চারিদিক । খুব সন্তর্পণে ওই ঘুপচি জায়গা থেকে একছুটে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের আড়ালে ঝুপ করে লুকিয়ে পড়ল টুহো । সেখান থেকে উঁকি মারল । ভোঁ-ভাঁ ! জনমনিষ্যির নাম-গন্ধ নেই ! কেমন একটা সন্দেহ চেপে ধরল টুহোকে । ভাবল, তবে কি লুলাম এখানে নেই ! একটা না-জানা ভয়ে সে শিউরে ওঠে ! না, এখানে তো ভিতুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা চলে না তার ! তবু হুট করে এগিয়ে যাওয়া, সেটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় ! তাই, সে নিঃসাড়ে এগিয়ে চলল মন্দিরের ফটকটাকে লক্ষ্য রেখে । হ্যাঁ, এগিয়ে এসেছে সে মন্দিরের একেবারে কাছাকাছি । তারপর পৌঁছে গেল ফটকটার সামনে । কিন্তু এ কী ! ফটক বন্ধ কেন ? সত্যিই তো কেউ নেই ! না কোনো পাহারাদার, বা মন্দিরের অন্য কোনো মানুষ । চারিদিক নিঝুম, জনমানবশূন্য । কিন্তু মুসড়ে পড়লে তো চলবে না । এখানে যদি লুলাম না থাকে, তবে অন্য আর কোথা সে থাকতে পারে ! যেখানেই থাক, খুঁজে সে বার করবেই । তার আগে এই মন্দিরটা তাকে দেখতেই হয় । কিন্তু মন্দিরের ভেতরে টুহো ঢুকবে কেমন করে ? ফটক তো বন্ধ ! তাই বলে হাল ছাড়লেও তো চলবে না ! প্রতিজ্ঞা তার, যেমন করে হোক মন্দিরের চত্বরে তাকে ঢুকতেই হবে । কিন্তু মন্দিরের এই উঁচু পাঁচিল সে কেমন করে টপকাবে ?

ভাবতে ভাবতে মন্দিরের বাইরে সে চোখ মেলে ঘুরতে লাগল ।

হঠাৎ সে দাঁড়ায় কেন ? যেন থমকে চায় ! সামনে ওটা কী ?

একটা মস্ত উঁচু পাথর । মন্দিরের পাঁচিলের লাগোয়া পড়ে আছে ।

এবার ছুটে গেল টুহো পাথরটার সামনে । হ্যাঁ, সে রাস্তা খুঁজে পেয়েছে । এখন সে সহজেই ওই পাথরের ওপরে উঠে, পাঁচিলে লাফ মারতে পারে । সত্যি সত্যিই সে পাথরটার গা বেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তার মাথায় । উত্তেজনায় টুহোর যেন বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে । সে যেন পাঁচিলে লাফ দিতে ভয় পাচ্ছে ! কিন্তু এখানে তো এভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়ানোও ঠিক নয় ! যে-কোনো মুহূর্তে মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে ! সুতরাং আর তিলেক অপেক্ষা না করে, পাঁচিল লক্ষ্য রেখে টুহো মেরেছে লাফ ! ধাঁই করে পাঁচিলের গায়ে টুহো মারল এক ধাক্কা । হাত ফসকাল । মুখ থুবড়ে মেরেছে ডিগবাজি ! পাথরের ওপর মুখটা প্রচণ্ড ঘা খেয়ে ঘষটে গেল তার ! কে জানে রক্ত ঝরছে কিনা ! রক্ত দেখবে কে ? ভয়ে মুহূর্তের জন্যে যেন তার বুকের শব্দটা স্তব্ধ হয়ে গেল ! কেননা, ওর ডিগবাজি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, "কে ?"

টুহো যেমন করে পড়েছিল, ঠিক তেমনি করে পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়াল । নিমেষের জন্যে অপেক্ষা না করে ঝট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল । হাত-পা তার কাঁপছে উত্তেজনায় । যাঃ ! তার সব চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায় ! ছিঃ ! ছিঃ ! আর একটু ধৈর্য ধরলে, এমন দুর্ঘটনা না-ও তো ঘটতে পারত ! কিন্তু সে-কথা এখন ভাবা আর না-ভাবা দুই-ই সমান ! কেননা, টুহো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, সেই চিৎকার আরও ব্যস্ত স্বরে ফুঁসে উঠছে, "কে ? কে ?"

টুহো যেন এই গাছের আড়ালে এখন একটি পাথরের মূর্তি । নিশ্চল, নিশ্চুপ !

হঠাৎ মন্দিরের ফটকটা খুলে গেল । ছ্যাঁত করে উঠল টুহোর বুকটা । এখান থেকে টুহো স্পষ্ট দেখতে পেল, মন্দিরের ফটক পেরিয়ে কে একজন বেরিয়ে এল । তার একহাতে লণ্ঠন, আর একহাতে ধনুক । সে বিস্ফারিত চোখে এ-ধার ও-ধার দেখছে । চিৎকার করছে, "কে এখানে ?"

কী প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা । ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে টুহো ! বুকের শ্বাস যেন তার রুদ্ধ হয়ে আসছে ! আসবেই তো !

লোকটা যদি হঠাৎ টুহোকে দেখে ফেলে ! দেখে ফেললে যে মৃত্যু, এ-কথাটা টুহো ভাল করেই জানে ! অবিশ্যি টুহোর হাতেও তীর-ধনুক আছে। সে ইচ্ছে করলে এই আড়ালে দাঁড়িয়েই এখনই লোকটাকে শেষ করে ফেলতে পারে। ওই তো লোকটা লণ্ঠনটা ওপর দিকে তুলে চোখ ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক সবদিকই। এ কী ! লোকটা এবার মন্দিরের ফটক ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল যে ! ওই তো মন্দিরের পিছনদিকটা দেখার জন্যে লোকটা ঝোপঝাড় সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ! এগিয়ে যাচ্ছে টুহোর চোখের আড়ালে। রোমাঞ্চিত হচ্ছে টুহোর সারা শরীর ! লোকটা দেখতে দেখতে মন্দিরের ফটকটা খোলা রেখেই একেবারে আড়ালে চলে গেল ! এখান থেকে টুহো যদি এই মুহূর্তে একছুটে ওই ফটক ডিঙিয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়ে, কেউ জানতেও পারবে না। হ্যাঁ, ওই তো ! টুহো সত্যি সত্যিই ছুট দিয়েছে ! ওই তো, সে ছুটতে ছুটতে মন্দিরে ঢুকে পড়ল। ওই তো ভেতর থেকে মন্দিরের ফটক বন্ধ করে দিল। তারপর হাঁকপাঁক করে খুঁজতে লাগল লুলামকে।

না, এই অন্ধকারে সে তো দেখতে পাচ্ছে না লুলামকে। অগত্যা সে খুবই ব্যস্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে ডাক দিল, "লুলাম !"

সে সাড়া পেল না। আবার ডাকল, "লুলাম, লুলাম !"

ঠিক তক্ষুনি বাইরের ফটকে ঘা পড়ল.। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই লোকটা !

আঁতকে উঠেছে টুহো। গলার স্বর তার আপনা থেকেই যেন তীব্র হয়ে ডেকে উঠল, "লুলাম !"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে ফটকের বাইরে সেই লোকটাও চিৎকার শুরু করে দিলে, "কে ফটক বন্ধ করেছে ! ফটক খোলো, ফটক খোলো !"

টুহো অন্ধকারে দু হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল, "লুলাম, লুলাম !"

লোকটাও ধাক্কা দিচ্ছে ফটকে, যত শক্তি আছে তার সব শক্তি দিয়ে। যেন ফটক ভেঙে ফেলতে চায় ! তেমনি গলা ফাটিয়ে যতই চিৎকার করছে, ততই যেন চমকে উঠছে টুহোর বুকটা ! টুহো যেন হাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধকারে কোথায় এসে থমকে গেল টুহো ! কে যেন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে ! কে ও ! ওই তো লুলাম ! ভোর হলেই ওকে হত্যা করা হবে, অথচ এখন এমন নিশ্চিন্তে কেমন করে ও ঘুমিয়ে আছে ! হয়তো কেঁদে-কেঁদে যখন আর পারেনি, পারেনি জেগে থাকতে, ওর ক্লান্ত চোখে তখনই বুঝি ঘুম নেমে এসেছে ! টুহো মুহূর্ত দেরি করল না। লুলামের গায়ে হাত রাখল। ডাক দিল। তার হাতের স্পর্শে জেগে উঠেছে লুলাম ! যেন ভয় পেয়েছে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, "কে !"

"আমি, টুহো।"

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে লুলাম। অবাক চোখে অন্ধকারে টুহোকে দেখতে-দেখতে সে যেন বোবা হয়ে গেল।

টুহো বলল, "তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। এক্ষুনি।"

লুলামের বোবা মুখে ভয়ের স্বর, "কোথায় ?"

টুহো ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিল, "তোকে বাঁচতে হবে।"

লুলাম ভয়ে ভয়েই উত্তর দিল, "আমি তো এখানে বন্দী হয়ে আছি। বাঁচব কেমন করে ?"

টুহো লুলামের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, "আমি

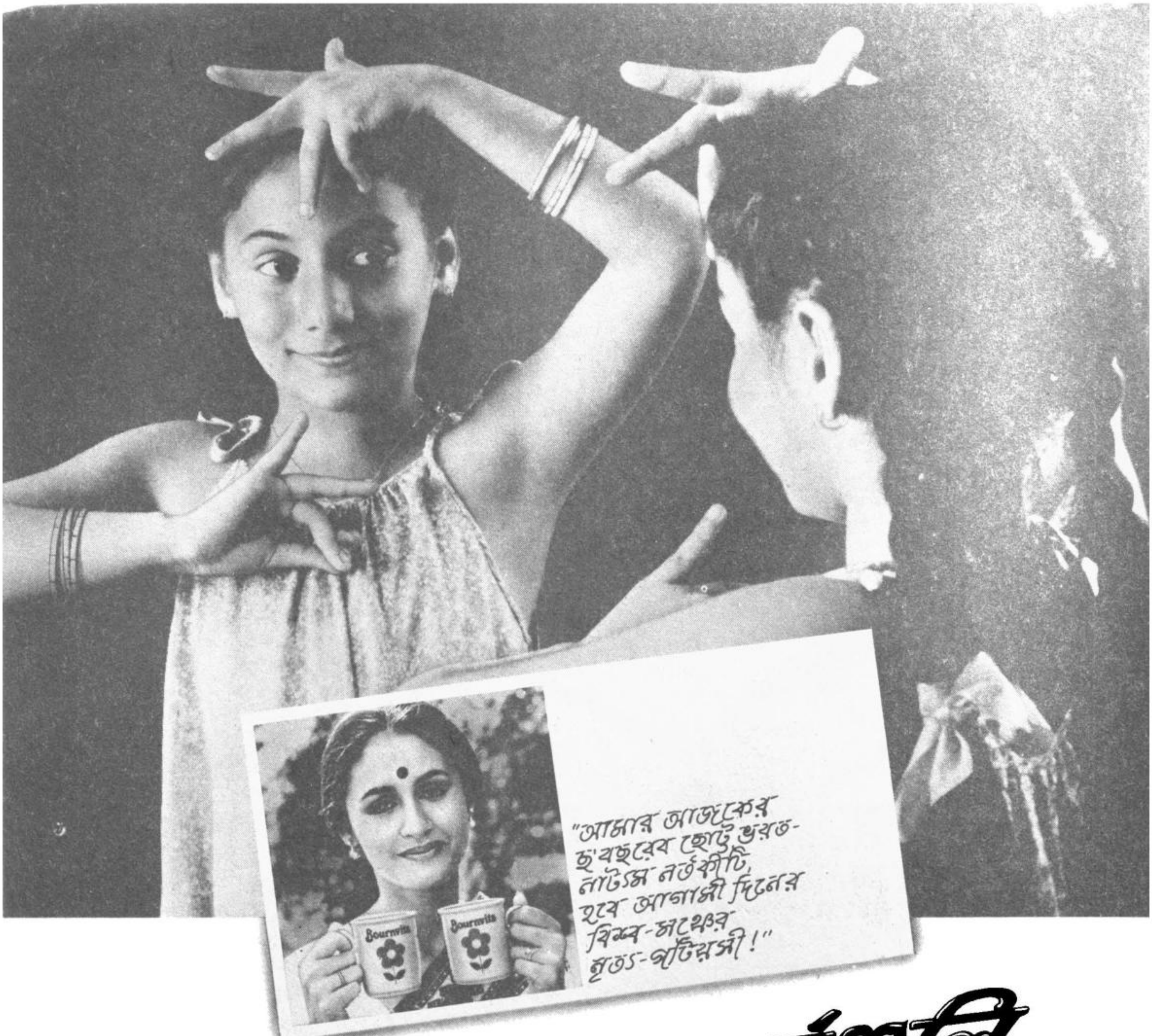

বোর্নভিটা ভরা বর্ষগুলি

যার জন্যে এরা একদিন আপনাকে জানাবে তাদের কৃতজ্ঞতা।

বাড়ন্ত বাচ্চারা, অন্য আর সব মল্টেড পানীয়ের মধ্যে বোর্নভিটা-ই কেন সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে? কেন দু'পুরুষ ধরে মা বাবারা জোরের সঙ্গেই বলেন। তাদের বাচ্চাদের অন্য কোন পানীয়তে কাজ হবে না?

এশুধু এটির মজাদার স্বাদের জন্যে নয়। এমন কি ক্যাডবেরিস্ নামটির জন্যেও নয়। এর কারণ অন্য কিছু। বিশেষ কিছু। এ হ'ল বোর্নভিটা, যে পানীয়ের গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
পালন-পোষণ সঠিকভাবে করুন,
বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান।

আছি। আমি তোকে বাঁচাব। আমার হাতটা ধর তাড়াতাড়ি। পালাতে হবে। শুনতে পাচ্ছিস না বাইরে, ফটকে ধাক্কার শব্দ!"

লুলাম টুহোর হাতটা জাপটে ধরে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কোন্ রাস্তা দিয়ে পালাবে?"

টুহো তেমনি উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিল, "জানি না। এখন আমাদের মন্দিরের ছাতে যেতে হবে। আয়।" বলে টুহো লুলামের হাত ধরে, অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে ছাতের সিঁড়ি খুঁজতে লাগল।

শেষমেশ তারা যখন সিঁড়ি খুঁজে পেল, তখনও কিন্তু লোকটা চেল্লাচিল্লি চালিয়ে যাচ্ছে। ছাতে উঠে পড়েছে দু'জনেই। লোকটার হাতে লণ্ঠন। সুতরাং এই ছাতের আড়াল থেকে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টুহো আর লুলাম। লুলাম তাকে দেখে চাপাগলায় টুহোর প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলল, "পুরোহিত!"

টুহো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল, "ও, ইনিই সেই পুরোহিত! ইনিই অকম্মের পাণ্ডা।"

লুলাম তেমনই চাপা স্বরেই বলল, "ছাতের উপর থেকে আমাদের তো পালাবার উপায় নেই!"

টুহো গলার শব্দটাকে এবার রুক্ষ করে উত্তর দিল, "আমাদের পালাবার রাস্তা পরিষ্কার করে নেবার উপায় আমার হাতেই আছে। দেখো কী করি।" বলে টুহো কাঁধ থেকে ধনুকটা নামিয়ে তীর জুতে নিশান করল পুরোহিতের কপালটা। তারপর চোখের পলকে সেই তীর ছুড়ে দিল। কে জানে লাগল কিনা! কিন্তু লোকটা আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল, তার হাতের লণ্ঠনটা ছিটকে দপ্ করে নিবে গেল। তারপর সেই পুরোহিত বোধহয় পাহাড়ের উঁচু-নিচু পাথরের বাধা তুচ্ছ করে, প্রাণের দায়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, দেখতে পেল না টুহো। নিমেষে সেই পাহাড়চূড়ায় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই নিস্তব্ধতা কী ভয়ংকর রহস্যময়!

টুহো যেন তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মন বলে, যদি পুরোহিতের গায়ে তীর না লেগে থাকে! যদি লোকটা কাছে-পিঠে লুকিয়ে থাকে তাকে পাকড়াও করবার জন্যে! তাই সে লুলামকে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ছাতের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। কান খাড়া করে রইল সে! হাতের তীর ধনুকে জুতে তৈরি থাকল।

না, কোনো কিছুরই হদিস সে পেল না। না কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর, না কোনো ভয়ের লক্ষণ। হন্তদন্ত হয়ে, লুলামকে সঙ্গে নিয়ে টুহো ছাত থেকে নেমে এল নীচে। আশ্চর্য কথা, মন্দিরে আর কিন্তু একটিও প্রাণী ছিল না। কেন ছিল না, সে নিয়ে ভাববার সময় তো এখন নয়! এখন টুহো মন্দিরের ফটকটা চটপট খুলে ফেলল। ফটক পেরিয়ে টুহো লুলামকে নিয়ে পাহাড়ের ঘন-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গেল।

আর একটু পরেই শেষ রাতের অন্ধকার ভোরের আলোয় ঝলসে উঠবে। সুতরাং আলো ফোটার আগেই যেমন করে হোক পাহাড় ডিঙিয়ে নীচে নেমে আসতে হবে টুহো আর লুলামকে। তারপর পাহাড়ের জঙ্গল থেকে, নীচের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তে হবে। কারণটা তো স্পষ্ট করে না বললেও সবাই জানে। একটু পরেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। একটু পরেই 'ধর ধর' রব তুলে জঙ্গলের মানুষ যে তাদের খোঁজে জঙ্গল তোলপাড় শুরু করে দেবে সেটা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। আর তখনও যদি পাহাড় থেকে তারা নেমে আসতে না পারে, তবে ধরা তারা পড়বেই। ব্যর্থ হবে টুহোর এত চেষ্টা সব। তখন তাদের কে রক্ষা করবে!

অবিশ্যি এখনও এই পাহাড় থেকে নামবার সময়েও তারা অত্যন্ত সতর্ক। কেননা, পুরোহিতের সেই হিংস্র চোখদুটোকে, কিংবা তার সেই ভয়ংকর চিৎকার এখনও তুচ্ছ করার সময় হয়নি। তাই সাবধান, খুব সাবধান।

হ্যাঁ, ওই পাহাড়ের কঠিন পাথর ওদের যতই বাধা দিচ্ছে, ওরা যেন ততই দুরন্ত সাহসে সেই পাথর টপকে টপকে এগিয়ে চলেছে। আর ওদের সজাগ দৃষ্টিটা চমকে চমকে এপাশ ওপাশ উঁকি মারছে। কখনও দুজনে গভীর খাতে লাফিয়ে নামছে, হাঁচড়-পাঁচড় করে আবার উঠছে। হোঁচট খাচ্ছে, পড়ছে, এগিয়ে চলছে।

এমনি করতে করতে কখন যে সকাল হয়ে গেল, দুজনের খেয়াল নেই। এই সকালের আলোকে ফাঁকি দিয়ে, পাহাড়ের শেষধাপ ডিঙিয়ে দুজনেই গহন বনে ঢুকে পড়ল। আঃ! এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। বিপদ না কাটলেও ভাবতে পারা যায়, এখনকার মতো ওরা বেঁচে গেছে। গাছের ডালে, বন উপচে পড়া পাখির ডাক, ডানার শব্দ আর সেই সঙ্গে পাতায়-পাতায় এই সকালের উজল আলোর উঁকিঝুঁকি যেন জানান দিচ্ছে, বনেরও ঘুম ভেঙেছে! বনও কি ঘুমোয়? ক্লান্তিতে বনের চোখদুটিও কি ঘুমের আবেশে জড়িয়ে আসে? কে জানে!

কিন্তু এখন এই যে ছোট্ট দুটি বন্ধু শত্রুর ধারালো অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে বনের বুকের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, তারা যেন পারছে না আর! ক্লান্তি যেন জড়িয়ে ধরেছে। বেচারা লুলামের পা দুটি যেন আর ছুটতে চাইছে না। তবু এখানে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বুক-ভর্তি দম নিতে সাহসও হল না তাদের। আরও একটু গভীরে না যাওয়া পর্যন্ত যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না তারা। তাই যত কষ্টই হোক, ছুটবে তারা। ছুটবে আরও, আ-র-ও গভীরে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লুলাম। কেন তার চোখদুটি অমন ভয়ে বিহ্বল! টুহোর হাতটা সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। অমন আড়ষ্ট হয়ে কী দেখে সে হাঁপাচ্ছে! টুহো ওর মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

লুলাম সামনের ঝোপের দিকে আঙুল দেখাল।

টুহো সেদিকে চোখ ফিরিয়ে আতঙ্কে থমকে গেল। দেখল, এখানের এই ঝোপটার ওপাশে খানিকটা খোলা জায়গা। জায়গাটা ঘিরে চারদিকে আবার জঙ্গল। টুহো দেখল, এখানে একদল জলদস্যু ঘাঁটি গেড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে টুহোর যেন সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ওর যেন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে! এখনই যে একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে পড়া উচিত, সে-কথা না ভেবে হাঁদার মতো ফ্যালফ্যাল করে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কী আশ্চর্য! ওর কি কোনো হুঁশ নেই! এক্ষুনি ওই দস্যুর দল দেখতে পেলে যে ওদের কম্ম শেষ করে দেবে! (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

লালচুল সমিতি

সার আর্থার কোনান ডয়েল

এই ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরের শরৎকালের গোড়ায়। একদিন শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, সে বেশ মোটাসোটা লালমুখ এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব নিবিষ্ট হয়ে কথাবার্তা বলছে। আমার চোখ পড়ল ভদ্রলোকের মাথার ওপর। তাঁর মাথার চুল একদম টকটকে লাল। অসময়ে এসে পড়ে তার কাজের অসুবিধে ঘটানোর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই হোম্‌স আমাকে প্রায় একরকম জোর করেই ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

শার্লক হোম্‌স খুশি-খুশি গলায় বলে উঠলে, "ওয়াটসন, বড় ভাল সময়ে এসে পড়েছ।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছ।"

"ঠিক ধরেছ। খুব জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছি।"

"তাহলে আমি নাহয় ততক্ষণ পাশের ঘরে বসি গে।"

"আরে ব্যাপারটা জরুরি বলেই তো বলছি যে, তুমি এসে পড়ায় বেশ ভাল হল।"

তারপর সেই ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে হোম্‌স বললে, "মিঃ উইলসন, ইনি আমার সহকারী ডঃ ওয়াটসম। এঁর সাহায্যে আমি অনেক জটিল সমস্যার সুচারু সমাধান করেছি। মনে হচ্ছে যে আপনার এই রহস্যের তদন্তেও এঁর সাহায্য আমার দরকার হবে।"

হোম্‌সের কথায় ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ মাংসল ভারী মুখ। ছোট-ছোট গোল চোখ চর্বিতে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

"ওয়াটসন, তুমি ঐ সোফাটায় বোসো।"

হোম্‌স তার নিজের আরাম-কেদারায় আধশোয়া হয়ে তার অভ্যাসমতো দু-হাতের আঙুলের ডগাগুলো ঠেকাতে লাগল।

"ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রের মিল কোথায় জানো? আমাদের একঘেয়ে প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা রুটিনের বাইরে যেসব অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, তার প্রতি আমাদের দুজনেরই একটা টান বা দুর্বলতা যা-ই বলো আছে। আর তা না হলে তুমি আমার এই সব সামান্য রহস্য সমাধানের ঘটনাগুলো অত যত্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে না। ঠিক কি না বলো?"

আমি বললুম, "তুমি তো জানো যে, রহস্যের সমাধানে তোমার যে কৌশল—যা আসলে তোমার অসামান্য বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি আর বিশ্লেষণক্ষমতা—তা আমার কী রকম ভাল লাগে।"

আমাকে বাধা দিয়ে হোম্‌স বললে, "তোমার বোধহয় মনে আছে, মিস মেরি সাদারল্যাণ্ডের অত্যন্ত সহজ সরল সমস্যাটা তদন্ত করবার সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তোমাকে বলেছিলুম যে, আমাদের চারপাশে রোজই এমন সব অদ্ভুত, এমন সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে যা কল্পনাই করতে পারা যায় না। সত্যি কথা বলতে কী, বাস্তব জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা অভিনবত্বে কাল্পনিক রহস্য-কাহিনীকেও হার মানায়।"

"হ্যাঁ। আমার মনে আছে। আর এও মনে আছে যে, এ-ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারিনি।"

"কিন্তু ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমার কথা মেনে নিতেই হবে। আমি তোমার সামনে একটার পর একটা এমন অকাট্য প্রমাণ এমন নির্ভুল তথ্য এনে হাজির করব যে, শেষকালে ঐ প্রমাণ আর তথ্যের চাপে তোমার সব যুক্তি ভেঙে একদম টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। এই মিঃ জাবেজ উইলসনের কথাই ধরো না। ইনি আমাকে এঁর জীবনের খুব সম্প্রতি-ঘটা এক অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। এ-রকম অদ্ভুত ব্যাপার আমি আগে কখনো শুনিনি। আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি যে, বড়-বড় খুন, ডাকাতি বা ঐ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার ভেতরে কোনো নতুনত্ব বা চমক থাকে না। কিন্তু ছোটখাটো অনেক ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময়ে খুব বিপদে পড়তে হয়। কখনও-কখনও এমনও হয়, এইসব অতি সাধারণ ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে এত তুচ্ছ বলে মনে হয় যে, সেগুলোর সঙ্গে কোনো দুষ্কর্মের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ আছে বলে ভাবতেই পারা যায় না। এতক্ষণ পর্যন্ত মিঃ উইলসনের মুখে ওর কথা যতটা শুনেছি তার থেকে এ-ব্যাপারটা আদৌ কোনো অপরাধমূলক ঘটনা কি না সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। তবে ওঁর অভিজ্ঞতা যে দারুণ ইণ্টারেস্টিং সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিঃ উইলসন, আপনি যদি দয়া করে আপনার বক্তব্য আর-একবার গোড়া থেকে বলেন তো খুব ভাল হয়। ভাববেন না যে ডাঃ ওয়াটসনকে শোনাবার জন্যে আবার আপনাকে সব কথা বলতে বলছি। আমি নিজেই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ আপনার মুখ থেকে আবার শুনতে চাই, যাতে সামান্যতম কোনো সূত্রও আমার নজর এড়িয়ে না যায়।

"সাধারণত আমি যখন কোনো সমস্যার কথা শুনি তখন আমি সর্বদা চেষ্টা করি সেই ঘটনার মধ্যে থেকে এমন কোনো সূত্র বের করতে, যার সঙ্গে আমার জানা কোনো ঘটনার মিল আছে। আর যখনই সে-রকম কোনো সূত্র পেয়ে যাই, তখনই আমার জানা ঐ ধরনের হাজার-হাজার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে আমি ঐ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করি। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আপনার এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন কোনো ঘটনার কথা আমার জানা নেই।"

হোম্‌সের কথা শুনে সেই শাঁসেজলে চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বেশ একটু গর্বিত ভাবে মাথা নাড়তে-নাড়তে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা বহু-ভাঁজ-করা ময়লা খবরের কাগজ বের করলেন। তারপর সেই কাগজটা তাঁর হাঁটুর ওপর

সম্পূর্ণ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন। আর সেই সুযোগে আমিও ভদ্রলোককে খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম। ইচ্ছে, হোম্‌সের পদ্ধতির নকলে আমিও ভদ্রলোক সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করতে পারি কি না দেখা।

আমাদের মক্কেলের চেহারা, পোশাক, হাবভাব অবিকল আর-পাঁচজন ব্রিটিশ ব্যবসাদারের মতোই। গোলগাল, ধীর-স্থির, চোখেমুখে একটু মুরুব্বিয়ানার ভাব। তাঁর পরিধানে চেককাটা ঢোলা ট্রাউজার্স, আধময়লা ফ্রক-কোটের বুকের বোতামগুলো খোলা। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ময়লা ওয়েস্টকোট আর তাতে একটা মোটা তামার অ্যালবার্ট চেন। চেনের থেকে একটা চৌকো আকারের ধাতব পদার্থ ঝুলছে। তাঁর টপহ্যাটটা বহুদিনের ব্যবহারে বেশ জীর্ণ হয়ে গেছে। আর চেয়ারের ওপরে রাখা তাঁর ওভারকোটের খয়েরি রঙটা একদম চটে গেছে। খুব খুঁটিয়ে দেখেও তাঁর অস্বাভাবিক লাল রঙের চুল আর চোখে মুখে হতাশা আর বিরক্তি ছাড়া কিছুই লক্ষ করলুম না।

হঠাৎ খেয়াল হল যে, শার্লক হোম্‌স আমাকে দেখছে। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে হেসে বললে, "এই ভদ্রলোককে জীবনের এক সময়ে কঠোর শারীরিক শ্রম করতে হয়েছে। এঁর নস্যি নেবার অভ্যেস আছে। ইনি ফ্রি-মেসন দলের সভ্য। চিনদেশে ঘুরে এসেছেন। আর সম্প্রতি খুব লেখালেখির কাজ করছেন। এর বাইরে আমি আর কিছু জানতে পারিনি।"

ভয়ানক রকম চমকে উঠে মিঃ জাবেজ উইলসন শার্লক হোম্‌সের দিকে তাকালেন।

"কী আশ্চর্য! এসব কথা আপনি কেমন করে জানলেন বলুন তো? মিঃ হোম্‌স, আপনি কি ম্যাজিক জানেন? সত্যি করে বলুন তো কী করে জানলেন যে, আমি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতুম। ঠিক বলেছেন, এক সময়ে আমি জাহাজ তৈরির কারখানায় ছুতোরের কাজ করতুম।"

"যে-কেউ আপনার হাতের দিকে ভাল করে লক্ষ করবে সেই বুঝবে যে আপনার ডান হাতের পেশি বাঁ হাতের পেশির চেয়ে মোটা, প্রায় এক সাইজ বড়। এটা তখনই হতে পারে যদি আপনি আপনার ডান হাতকে বাঁ হাতের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়ে থাকেন।"

"বুঝলুম। কিন্তু নস্যি নেওয়ার আর ফ্রি-মেসন সংস্থার ব্যাপারটা কী করে জানলেন?"

"সে কথা খুলে বলব না। বললে আপনার বুদ্ধির অপমান করা হবে। বিশেষত আপনি যখন আপনার দলের সুস্পষ্ট নিয়ম না মেনে বুকে ঐ রকম 'টাই-পিন' লাগিয়েছেন।"

"ও হো! এইটের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু লেখার কথা আপনি কী করে বুঝলেন?"

"আপনার ডান হাতের জামার কাছে প্রায় পাঁচ-ইঞ্চি পরিমাণমতো খুব চকচকে আর বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে একটা বেশ মোটা গোল দাগ পড়েছে ডেস্ক বা টেবিলের ওপর ভর দিয়ে রাখার জন্যে।"

"এটাও বোঝা গেল। কিন্তু চিনে যাওয়ার ব্যাপারটা?"

"আপনার ডান হাতের কবজির ঠিক ওপরে একটা মাছের উল্‌কি আঁকা রয়েছে। ঐ ধরনের মাছ শুধুমাত্র চিনদেশেই

আঁকা হয়ে থাকে। বিচিত্র ধরনের উল্‌কি আঁকার পদ্ধতির ওপর আমার কিছু পড়াশোনা আছে। এ-বিষয়ে আমি একটা পুস্তিকাও লিখেছি। ঐ মাছের আঁশে যে খুব ফিকে গোলাপি রঙ দেওয়া হয়েছে তা একমাত্র চিনে শিল্পীরাই পারে। আমি আরো নিশ্চিত হলুম যখন দেখলুম আপনার ঘড়ির চেনে একটা চিনের মুদ্রা লাগানো।"

হোম্‌সের কথা শুনে মিঃ উইলসন খুব একচোট হেসে ফেলে বললেন, "সত্যি প্রথমটায় আপনি আমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। আমি তো থ। ভাবছিলুম কী অলৌকিক কাণ্ড! এখন দেখছি সবটাই তো জলবৎ তরল।"

"বুঝলে ওয়াটসন, সবাইকে সব কথা খুলে বলে আমি বোধহয় আমার নিজের ক্ষতি করছি। লোকে যে জিনিসটা বুঝতে পারে না সেটাকে খুব বড় করে দেখে। এই রকম করে সকলকে সব কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললে বাজারে আমার যে সামান্য খাতির আর খ্যাতি হয়েছে তা দু'দিনে তলিয়ে

যাবে।··· আপনি কি সেই বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন, মিঃ উইলসন।"

"হ্যাঁ। এই যে।" তিনি বিজ্ঞাপন কলমের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালেন। "এই সেই বিজ্ঞাপন। আপনি নিজেই পড়ুন," বলে মিঃ উইলসন কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লুম। বিজ্ঞাপনটা এই রকম :

লালচুল সমিতির সদস্যদের জন্য

আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের লেবানন শহরের পরলোকগত এজেকিয়া হপ্‌কিন্‌সের প্রদত্ত টাকায় সমিতির সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক চার পাউণ্ড বেতনের একটি চাকরির সুযোগ করা সম্ভব হয়েছে। কাজ খুবই সামান্য। পঁচিশ বছর বয়সের ওপর সমস্ত লালচুল লোক যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম তারা সকলেই প্রার্থী হতে পারে। সোমবার বেলা এগারোটার পরে ৭ নং পোপস্ কোর্টে, ফ্লিট স্ট্রিটে সমিতির সদর দফতরে মিঃ ডানকান রসের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

বিজ্ঞাপনটা আগাগোড়া বারদুয়েক পড়েও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। হোম্‌সকে জিজ্ঞেস করলুম, "এর মানে কী?"

"ব্যাপারটা খুবই অভিনব নয় কি?" বলে হোম্‌স মুচকি হেসে তার আরাম-কেদারায় দুলতে লাগল। আমি জানি যে যখন কোনো কারণে হোম্‌স খুব খুশি হয় তখনি সে এইরকম দোল খেতে খেতে মুচকি হাসে। তার এত খুশি হওয়ার কারণ কী?

তারপর মিঃ উইলসনের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স বললে, "এবার আপনার কথা বলুন। একদম গোড়া থেকে বলবেন। কোনো কিছু বাদ দেবেন না। আপনার নিজের কথা, আপনার সংসারের কথা, কী ভাবে এই বিজ্ঞাপনটা আপনার নজরে পড়ল, এটা পেয়ে আপনার কী মনে হল, সব কথা খুলে বলবেন।··· তার আগে, ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনটা কত তারিখে কোন্ কাগজে বেরিয়েছিল দেখো তো।"

"এটা বেরিয়েছিল 'দি মর্নিং ক্রনিকল' পত্রিকায়। আর তারিখ হচ্ছে ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০। অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক দু-মাস আগে।"

"বেশ। ··· মিঃ উইলসন, এবার আপনি বলতে শুরু করুন।"

রুমাল দিয়ে ঘাড়-মুখ মুছতে মুছতে মিঃ উইলসন বলতে লাগলেন, "আপনাকে তো বলেছি মিঃ শার্লক হোম্‌স যে, আমার একটা ছোট বন্ধকীর কারবার আছে। কোবুর্গ স্কোয়ারে আমার দোকান। কারবার আমার সামান্যই। ইদানীং কারবারে বেশ মন্দা যাচ্ছে। যা আয় হয় তাতে আমার কোনোরকমে চলে যায়। আগে আমার দোকানে দুজন কর্মচারী ছিল। এখন একজন আছে। যে আছে তাকে যদি পুরো মাইনে দিতে হত তাহলে তাকে রাখা সম্ভব হত কি না জানি না। নেহাত বন্ধকী-কারবার শেখবার আগ্রহেই সে কম মাইনেতে কাজ করতে রাজি হয়েছে।"

হোম্‌স বললে, "তা এই ভালমানুষ ছেলেটার নাম কী?"

"ভিনসেন্ট স্পলডিং। না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম বাচ্চা ছেলে নয়। অবশ্য ওর বয়স কত তা ঠিক আমি জানি না। কিন্তু বেশ চালাকচতুর ও চটপটে। আমি জানি, ও যেরকম কাজের ছেলে তাতে ও যদি অন্য কোথাও কাজ করত তা হলে আমার কাছে যা পাচ্ছে তার দ্বিগুণ পেতে পারত। কিন্তু ও যদি এই অল্প মাইনেতে সুখী থাকে তো এসব কথা বলে ওর মাথা খারাপ করে দেওয়ার কোনো মানে হয়কি?" বলে মিঃ উইলসন আমাদের দিকে তাকালেন।

"সে তো বটেই। তবে আপনার কর্মচারী-ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে। এ-যুগে ক-জন মালিক এ রকম কর্মচারী পায়? এ তো যাকে বলে বামুনের গোরু। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। আপনার এই কর্মচারীটি আপনার ঐ লালচুল সমিতির বিজ্ঞাপনের চেয়ে কোনো অংশে কম অদ্ভুত নয়।"

শার্লক হোম্‌সের কথার উত্তরে মিঃ উইলসন বললেন, "তা বলে ভাববেন না যে, ও একেবারে দেবদূত, কোনো দোষ নেই। ছবি তোলার নেশায় ও একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। একটু ফুরসত পেলেই ছবি তুলবে আর আমার বাড়ির তয়খানায় নেমে গিয়ে ফিলম ডেভালপ করতে লেগে যাবে। এই এক দোষ ছাড়া ওর আর কোনো দোষ নেই। কাজের লোক। হাতটান নেই।"

"ও কি এখনও আপনার কাছেই কাজ করছে?" শার্লক হোম্‌স প্রশ্ন করলে।

"হ্যাঁ। আমার সংসার বলতে তো আমি, ঐ ভিনসেন্ট আর একটি অল্প বয়সী মেয়ে। সে আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করে, রান্নাবান্না করে। আমার স্ত্রী মারা গেছেন অনেকদিন আগে। আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমাদের এই ছোট সংসারে কোনো গণ্ডগোল নেই। হঠাৎ আজ থেকে ঠিক মাসদুয়েক আগে একদিন ভিনসেন্ট এই খবরের কাগজখানা নিয়ে দোকানে হাজির হল।

"'ও হো মিঃ উইলসন, যদি কোনো ফুসমন্তরে আমার চুলের রঙ লাল হয়ে যেত তো কী ভালই না হত।'

"'এ-কথা কেন বলছ ভিনসেন্ট?'

"'কেন বলছি? এই তো আজকের কাগজেই লালচুল সমিতির একটা চাকরির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওহ্, যার বরাতে এই চাকরিটা জুটবে সে ফোকটে বেশ মোটা টাকা পেয়ে যাবে। আমি শুনেছিলুম যে, ওদের নাকি যত না সদস্য তার চেয়ে ঢের-ঢের বেশি টাকা আছে। ওরা নাকি টাকা কী ভাবে খরচ করবে ভেবে পায় না। তাই তো বলছি যে, যদি ভগবানের দয়ায় আমার সব চুল এই মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে যায় তো কে বলতে পারে যে ঐ চাকরির শিকেটা আমার ভাগ্যে ছিঁড়বে না?'

"এখন আসল কথা কী জানেন মিঃ হোম্‌স, আমি খুব ঘরকুনো প্রকৃতির লোক। আর তার ওপর আমাদের ব্যবসাটাও এমন যে, আমাদের তো কারবারের খাতিরে বাইরে যেতেই হয় না, উলটে খদ্দেররাই আমার কাছে আসে। তার ফলে কখনও কখনও এমন হয় যে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির চৌকাঠের বাইরে যাওয়া হয় না। তাই বাইরের জগতের খবরাখবর আমি বিশেষ রাখি না। সেই জন্যে ভিনসেন্টের কথায় আমার কৌতূহল হল।

"আমার কথায় বেশ আশ্চর্য হয়ে ভিনসেন্ট বললে, 'সে কী! আপনি এর আগে লালচুল সমিতির নাম শোনেননি?'

"'না তো।'

"'ভারী আশ্চর্যের কথা। আরে আপনি নিজেই তো ঐ চাকরিটার জন্যে আবেদন করতে পারেন।'

"'পয়সাকড়ি কী রকম দেবে?'

"'তা বছরে দুশো পাউণ্ড তো দেবেই। আর কাজও নাকি খুব হালকা। নিজের অন্যান্য কাজকর্মের ক্ষতি না করে এই চাকরি করা সম্ভব হবে।'

"আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, এ-কথা শুনে আমার খুব আগ্রহ হল। মনে হল যে, ব্যবসায় এই মন্দার সময়ে যদি উপরি দুশো পাউণ্ড আয় করা যায় তো মন্দ কী? তাই আমি ভিনসেণ্টকে বললুম আমাকে সব কথা খুলে বলতে।

"আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে ভিনসেণ্ট বললে, 'এই ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করলেই আপনি সব কথা জানতে পারবেন। আমি যা জানি তা হল এজেকিয়া হপকিনস বলে এক পাগলাটে আমেরিকান কোটিপতি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর নিজের মাথার চুল লাল ছিল বলে লালচুল লোকেদের প্রতি এঁর একটা আন্তরিক টান ছিল। ইনি এঁর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি এই সমিতিকে দান করে গেছেন লালচুল লোকেদের সাহায্যের জন্যে। এখন এই সমিতির পরিচালন-ভার পড়েছে এক ছোট কমিটির ওপর। এই কমিটি সঞ্চিত অর্থের সুদের টাকা খরচা করে লালচুলদের উপকারের জন্যে। আমি যতদূর শুনেছি কাজ নামমাত্র, তবে মাইনে ভাল।'

"আমি বললুম, 'কিন্তু লালচুল লোকের সংখ্যা তো কিছু কম নয়। প্রচুর লোক আবেদন করবে।'

"'আপনি যত লোক ভাবছেন, তত লোক নিশ্চয়ই নেই। আর তা ছাড়া দরখাস্ত করতে হলে বয়স পঁচিশের ওপরে এবং লণ্ডন শহরের বাসিন্দে হতে হবে। এই আমেরিকান ভদ্রলোক প্রথম জীবন কাটিয়েছিলেন এই আমাদের লণ্ডনে। তাই তাঁর উইলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, লণ্ডন শহরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাছাড়া চুলের রঙ তো যেমন-তেমন হলে হবে না। একদম টকটকে লাল হতে হবে। আমার মনে হয় আপনি যদি আবেদন করেন তো চাকরিটা আপনারই হবে। অবশ্য তার আগে ভাবতে হবে যে মাত্র কয়েকশো পাউণ্ডের জন্যে বাড়ির বাইরের কোনো কাজ করতে যাওয়া আপনার পোষাবে কি না।'"

এই পর্যন্ত বলে মিঃ উইলসন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চুল কী রকম গাঢ় লাল। তাই ভাবলুম একবার দেখাই যাক না। প্রতিযোগিতায় যে আমি প্রথম রাউণ্ডেই বাদ পড়ব না সে বিশ্বাস আমার ছিল। ভিনসেণ্ট যখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে এতই ওয়াকিবহাল তখন ও আমাকে হয়তো খানিকটা সাহায্য করতে পারে এই ভেবে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বলে ওকে আমার সঙ্গে আসতে বললুম। হঠাৎ এরকম ছুটি পেয়ে ও তো খুবই খুশি হল। দোকান বন্ধ করে আমরা বিজ্ঞাপনে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেই দিকে রওনা হলুম।

"সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলুম তাতে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। এ-রকম দৃশ্য অতীতে কখনও দেখিনি, আর ভবিষ্যতেও দেখব কি না সন্দেহ। লণ্ডন শহরের উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম চারদিক থেকে যার চুলে একটু লালের আভা মাত্র আছে এমন সব লোক সেখানে এসে হাজির। গোটা ফ্লিট স্ট্রিট জুড়ে কেবল লালমাথা আর লালমাথা। আর পোপস কোর্টকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন এক ফলওয়ালার বৃহৎ কমলালেবু ভর্তি ঝুড়ি। ঐ বিজ্ঞাপন দেখে যে অত লোক হাজির হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আর তাদের চুলেরও কত বিচিত্র রঙ। কারও বা চুলের রঙ খড়ের মতো, কারো বা ইঁটের মতো, কারো বা লেবুর মতো, কারো বা মেটের মতো, কারো বা মাটির মতো। কিন্তু ভিনসেণ্ট যা বলেছিল খুব কম লোকের চুলই আমার মতো গাঢ় টকটকে লাল। আমি ঐ ভিড় দেখে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু ভিনসেণ্ট কিছুতেই আমাকে ফিরে আসতে দিলে না। ভিনসেণ্টের আচ্ছা কেরামতি। ঐ ভিড়ের মধ্যে একে পাশ কাটিয়ে তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে, ওর বগলের তলা দিয়ে আমাকে নিয়ে সে আপিসের দরজায় এসে হাজির হল। সেখানে গিয়ে দেখি দু-দল লোক সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, তাদের সকলের মুখ উৎসাহ আর আশায় চকচক করছে। আর একদল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। তাদের কারো মুখ বেজার, কারো কারো মুখে গভীর হতাশা। যাক, কোনো মতে তো আমরা ঐ প্রথম সারি মানে ওপরে ওঠবার দলে ঢুকে পড়লুম। আর তারপর একসময় আপিসঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেলুম।"

এই পর্যন্ত বলে মিঃ উইলসন বেশ বড় এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে দিলেন। সেই সঙ্গে পরের ঘটনাগুলো মনে মনে ঠিক করে সাজিয়ে নিলেন।

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

এই আমার দুর্গা ঠাকুরের মুখ। আমি দুর্গা ঠাকুরকে খুব ভালোবাসি। [redacted] যখন পুজো হয় আমি নতুন জামা [redacted] পরি, সুন্দর করে চুল বাঁধি আর দুর্গাকে কতো গান গেয়ে শোনাই। দুর্গা ঠাকুর আমার দিকে কি রকম যেন তাকিয়ে থাকে। পুজো শেষ হয়ে গেলে দুর্গা ঠাকুর কোথায় যে চলে যায় [redacted] কে [redacted] জানে। মা বলে ঠাকুর নাকি স্বর্গ থেকে আসে আ[redacted]বার স্বর্গে চলে যায়।

ছবি ও লেখা সুবর্ণা বিশ্বাস বয়স (৮)

ঢাকি বাজায়

খুকুর মুখে মিষ্টি হাসি
বাতাসে পূজার গন্ধ,
কী আনন্দ, মন উতলা
পড়াশুনা সব বন্ধ।

শিউলি-বকুল-জুঁই-চামেলি
শিশির-ভেজা ঘাসে,
রোদ-ঝিলমিল মিষ্টি সকাল
মুখ টিপে তাই হাসে।

নতুন জামা কাপড় পরে
ঘুরব খুশি মনে,
রঙ-বেরঙের আতসবাজি
ফাটবে ক্ষণে-ক্ষণে।

ঢাকি বাজায় ঢাক কাঁধেতে
টাকডুমাডুম ডুম,
আমেজমাখা গভীর রাতে
নামবে চোখে ঘুম।

পূর্ণিমা দে (বয়স ৭)

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয়—স্বাস্থ্যেরই নাম। সারাদিন ধরে খাটুনীর পরে ... কিম্বা প্রচণ্ড হুটোপাটি করে খেলার মজার পরে, লাইফবয় দিয়ে স্নানের মজাই আলাদা! এ আবার আপনার মাঝে জাগিয়ে তোলে—এক সাফ আর সুস্থ অনুভূতি!

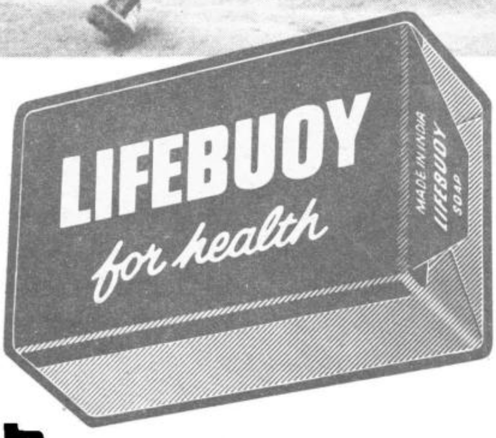

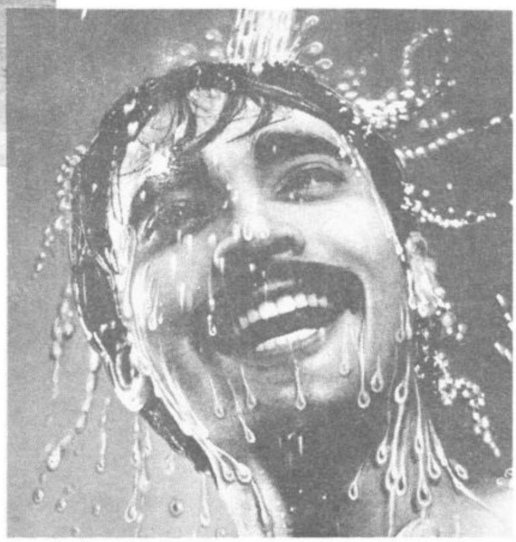

লাইফবয় ধূলোময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS L 88 2116 BG

বিনা টিকিটের যাত্রী

রঞ্জন ভাদুড়ী

ওরা দুজন শক্তিগড় স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। ওরা মানে দুই বন্ধু। সরিৎ আর সুজয়। ওরা এখন কলেজের ছাত্র। মাধ্যমিক পাশ করার পর দুজনে একই কলেজে ভরতি হয়েছে। ইস্কুলেও ভরতি হওয়া চলত, তবে কলেজে পড়ার প্রেস্টিজই আলাদা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ পেলে কে আর অন্য টিমে যেতে চায়! তাই কলেজে যখন সুযোগ পেয়ে গেল তখন সে-সুযোগ ছাড়ে কে! তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকের পর নতুন করে আর ভরতির ঝামেলা থাকবে না। এইসব বলে ওরা বাড়ির লোকজনেরও সম্মতি আদায় করেছিল। মা-বাবারা অবশ্য ইস্কুলের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মতে এত কম বয়সে কলেজে ঢুকলে নাকি লায়েক হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া কলেজের তুলনায় ইস্কুলগুলিতে পড়াশুনো ভাল হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা বেশি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই যুক্তির জবাবে ওরা দু' বন্ধুও যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বাড়িতে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল, তখন মা-বাবারা রাজি হয়ে গেলেন। আসলে ওরা মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছিল। দুজনে একই কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তোমাদের সময় তো উচ্চ মাধ্যমিককে আই· এ· বলা হত, আর সেটা স্কুলে পড়া যেত না—পড়তে হত কলেজেই। তোমরাও তো তাই পড়েছ! তাই বলে কি তোমরা খারাপ হয়ে গিয়েছিলে, না উচ্চশিক্ষা লাভ করোনি?' 'উচ্চশিক্ষা-লাভ' কথাটা শুনেই ওঁরা হেসে ফেলেছিলেন। অনেকটা রচনা-বইয়ের ভাষার মতো।

ক্লাস এখনো ভাল করে শুরু হয়নি। পনেরোই আগস্ট সোমবার পড়ায় পর-পর দুদিন ছুটিও পেয়ে গিয়েছিল। তাই দুই বন্ধুতে মিলে বেড়াতে এসেছিল বড়শুলে। বড়শুলে সুজয়ের মামা থাকেন। তিনি ওখানকার কো-অপারেটিভ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সুন্দর কোয়ার্টার পেয়েছেন। সুজয় অবশ্য আগেও এসেছে। সরিৎ এই প্রথম। জায়গাটা শক্তিগড় স্টেশন থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে। যাতায়াতের জন্য বাস-রিকশা রয়েছে। জি· টি· রোড থেকে পাকা রাস্তা বেরিয়ে গেছে মাঠের ভিতর দিয়ে। বড়শুল জায়গাটা খুব সুন্দর। না-শহর না-গ্রাম—অনেকটা শান্তিনিকেতনের মতো।

যাবার সময় হেঁটেই গিয়েছিল। ফেরার সময় অবশ্য বাসে এসেছে। সুজয়ের মামা শক্তিগড় পর্যন্ত এসে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে মামাকে নিরস্ত করেছে। বলেছে, 'আপনি কেন শুধু শুধু কষ্ট করে যাবেন। এইটুকু তো পথ, তা-ও বাসে যাব; আসবার সময় তো একা-একাই এসেছি—' সুজয়ের মামা হেসেছিলেন, 'আসবিই তো, বড় হচ্ছিস না!' হ্যাঁ, বড় তো হচ্ছেই, আর

সেইজন্যেই কথায় কথায় বড়দের গার্জিয়ানি আর ভাল লাগে না!

হাওড়ার দু'খানা টিকিট কেটে ওরা গাড়িতে উঠল। বর্ধমান থেকে প্রায় একসঙ্গে দুখানা লোকাল ট্রেন এসে পড়ায় একটু দোনামোনা করেছিল—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টায় উঠি। সেটা লক্ষ করে এক ভদ্রলোক উপদেশ দিলেন, 'ওটায় চলে যাও, কর্ড লাইনের গাড়ি—আগে পৌঁছবে।' তাঁর এই 'তুমি'-করে-বলা উপদেশ ওরা গায়ে মাখল না। মেন লাইনের গাড়িটাতেই উঠে বসল। তাছাড়া আসবার সময় কর্ড লাইনের গাড়িতে এসেছিল, ফেরার সময় মেন লাইন দিয়েই যাওয়া উচিত। গেলে দুই লাইনের অভিজ্ঞতাই হবে। বাইরের দৃশ্য-টিশ্য অবশ্য তেমন দেখা যাবে না, কারণ সময়টা সন্ধের কাছাকাছি। এর মধ্যেই স্টেশনের এবং গাড়ির আলো জ্বলে গেছে।

তিনমহলা কামরাটা বেশ বড়ই। ভিড়ও খুব-একটা নেই। সবে বর্ধমান ছেড়ে এসেছে। সামনের স্টেশনগুলোতে পর-পর ভিড় হতে থাকবে। ওরা কামরাটার বড় মহলে বসবার জায়গা পেয়ে গেল, অবশ্য জানলার ধারগুলো আগেভাগেই দখল হয়ে আছে। কর্ড লাইনকে ডাইনে সরিয়ে দিয়ে গাড়ি মেন লাইন ধরে ছুটে চলল। বড়শুলে দেড়টা দিন কেমন কাটল—ওরা সেই গল্প করতে লাগল।

রসুলপুর ও মেমারি থেকে অনেক লোক উঠল, নামলও দু-চারজন। যাত্রীদের ওঠানামার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিওলা এবং ভিখিরিরাও নামছে উঠছে। তাদের আবেদন-নিবেদন বক্তৃতায় কামরা একেবারে সরগরম।

আরো কয়েকটি স্টেশন পার হবার পর গাড়ি পাণ্ডুয়ায় এল। ইতিমধ্যে সরিৎ জানলার ধার পেয়ে গেছে। জানলা দিয়ে স্টেশনের নাম দেখে সে সুজয়কে বলল, 'সুজয়, এই সেই পাণ্ডুয়া—'

সুজয় শুধু ঘাড় নাড়ল। তাদের আশপাশের যাত্রীরা বুঝতে পারলেন, ছেলেদুটি তাদের বয়সী দুই হতভাগ্য কিশোরের কথাই এই মুহূর্তে ভাবছে, আভাসে ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

গাড়ি পাণ্ডুয়া স্টেশন ছাড়তেই সুজয় লক্ষ করল, একজন চেকার উঠেছে। জাঁদরেল চেহারা, গায়ে কালো জামা, কনুইয়ের ওপর-হাতে একটা লাল ফেট্টি জড়ানো, কাঁধে একটা ব্যাগ, খুব তাড়াতাড়ি যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করতে করতে ওদের দিকেই ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে টিকিট চাইতেই সুজয় পকেট থেকে দু'খানা টিকিট বার করল এবং চেকারের হাতে দিয়ে সামনের সিটে জানলার ধারে বসা সরিৎকে দেখিয়ে দিল—অর্থাৎ আমরা এই দুজন।

টিকিটে পেনসিলের আঁকিবুকি কেটে চেকারটি আস্তে আস্তে অন্যদিকে সরে গেলেন। লক্ষ করার বিষয় যে, ভদ্রলোক সবার টিকিট দেখতে চাইছেন না ; ভারিক্কে চেহারার যাত্রীদের কাছে তো নয়ই। চেকাররা অবশ্য বোঝে কার কাছে টিকিট আছে, আর কার কাছে নেই।

এরই মধ্যে চার-পাঁচজন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরে ফেলেছেন তিনি। তাঁর মধ্যে ভদ্র চেহারার একটি ছেলেও আছে। সুজয় ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল, ওদিকে দরজার কাছটায় অন্ধকার-মতো, অর্থাৎ ওখানটায় আলো নেই। জায়গাটাও

পুজোর দিনের ভাবনা

মহালয়া মানেই পুজোর শুরু।

রাস্তাঘাটে প্যাণ্ডেলের খুঁটি পোতা। আস্তে আস্তে তার ওপর রঙিন কাপড়ের সাজ উঠবে। ঠিক যেমন মা দুর্গার গায়ে মাটির ওপর রঙ চড়ছে। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। ব্যাস্। দশমীর সকাল মানেই প্রতিমার চোখে তাকানো যায় না। হু হু করে ওঠে মন। তারপরেই প্যাণ্ডেল খোলার পালা। যেখানে দুদিন আগে কত খুশী, কত আনন্দ, আজ সেখানে কিচ্ছু নেই। কিছুই কি নেই ? আছে বৈকি। বাঁশপোতার গর্তগুলো পুজোর শেষে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে তোমাদেরই মুখের দিকে চেয়ে। যেন বলছে "আমাদের বুজিয়ে দেবে না ?" সত্যি তোমরাই পার সকলে মিলে পাড়ায় পাড়ায় এইরকম অনেকগুলো কাজ করে ফেলতে। আর সেটাই হবে কলকাতার জন্য কলকাতার ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সাহায্যের হাত বাড়ানো।

আর একটা কথা হল বাজি। শব্দ তো আছেই। কিন্তু শব্দই হোক আর রঙিন আলোর ফুলঝুরিই হোক, বাজি সম্পর্কে সাবধানী হওয়া জরুরী। প্রত্যেক বছর কালীপুজো দুর্গাপুজোয় অনেকগুলি অগ্নিকাণ্ড হয়ে যায়। আর ভাল পুজো মানেই বড় প্রতিমা বা অনেক টাকা খরচের প্রতিযোগিতা নয়। এখনও অনেক পাড়ায় এইসব পুজোয় নতুন বস্ত্র বিলি করা হয়, কাঙ্গালী ভোজনও হয় কোথাও কোথাও। আজকাল অবশ্য কমে আসছে এমন পুজো। একটা পুজো মানে অনেকরকম জীবিকার মানুষেরই আনন্দ। যেমন শোলার কাজ, ডাকের সাজের বহর আজকাল ক্রমশ কমে আসছে। অথচ এগুলো হল আমাদের দেশের এক একটা শিল্প। ঢুলিও তাই। একটা বড় পুজোর অর্থ হয়ত এইরকম অনেকগুলি মানুষের কিছু জীবিকার সংস্থান। তোমাদের কি মনে হয় ?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

ফাঁকা-ফাঁকা। চেকারটি বিনা টিকিটের যাত্রী-কজনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তম্বি করতে লাগলেন। কী মনে করে সুজয়ও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। সে শুনতে পেল—চেকারটি বলছেন, 'ভাড়া আর ফাইন নিয়ে বাইশ টাকা করে পড়বে। যে না দিতে পারবে তাকে ব্যাণ্ডেলে গিয়ে জি· আর· পি-র লক-আপে পুরে দেব।'

ইতিমধ্যে সরিৎও উঠে এসে সুজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। মজার গন্ধ পেয়ে আরো কেউ-কেউ এদিকে এগিয়ে এসেছে। সেই জটলার দিকে একবার তাকিয়ে চেকারটি ধমকের সুরে বললেন, 'আপনারা শুধু-শুধু ভিড় করছেন কেন—' বাপ রে, গলাখানাও তেমনি। সেই বাজখাঁই গলা শুনে অনেকে পিছিয়ে এল। সুজয় সরিৎ শুধু অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল—যেন এসব ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহই নেই।

সুজয় আড়চোখে দেখল, ভদ্রগোছের ছেলেটি পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করেছে, অন্য গরিব লোকগুলোও নিজেদের পকেট, ট্যাঁক হাতড়াচ্ছে। তার মানে ঘুষ-টুষ দিয়ে সবাই চেকারের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। চেকারটা যার কাছে যা পেল হাভাতের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে পকেটে পুরল। এর মধ্যে গাড়ি একটা স্টেশন পার হয়ে এসেছে। আবার গতি কমছে, তার মানে সামনে আর একটা স্টেশন। সেই স্টেশনটার নাম তালাণ্ডু—সুজয় মাথা নিচু করে নাম-ফলকটা দেখে নিল। তারপর সরিৎকে চিমটি কাটল। দুজনে দরজার কাছে এল, যেন এখানেই নামবে। চেকারটা চলন্ত গাড়ি থেকেই প্ল্যাটফর্মে নামবার উদ্যোগ করছিল, সুজয় আর সরিৎ প্রায় একসঙ্গে তাকে খপাত করে ধরে ফেলল—সুজয় কোমর জাপটে ধরল, আর সরিৎ ধরল লোকটার হ্যাণ্ডেল-ধরা হাতখানা। তারপর দুজনে মিলে প্রাণপণে ভিতর দিকে হ্যাঁচকা টান।

লোকটা ভাবতেও পারেনি এমনটা ঘটতে পারে। এই আকস্মিক ঘটনায় সে হতভম্ব হয়ে গেল। যতই তাগড়াই চেহারা হোক, দুটি উঠতি বয়সের ছেলের সঙ্গে চট করে পারবে কেন? তার ওপর এই হঠাৎ-আক্রমণের জন্য সে একেবারেই তৈরি ছিল না, সুজয়কে নিয়েই হুড়মুড়িয়ে গাড়ির মেঝেয় পড়ে গেল। সে এক দৃশ্য। যারা ঘুষ দিয়ে রেহাই পেয়েছিল তারা মনে-মনে খুশি হল, আবার ভয়ও পেল—গাড়িতে চেকারের গায়ে হাত! জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ! আবার এক নতুন হুজ্জোতি বাধবে। তারা কেউ কেউ তালাণ্ডু স্টেশনে নেমে পড়তে গেল, কারণ গোলমালের মূলে তো তারাই, তাদের নিয়েও তো টানাহেঁচড়া হবে!

এদিকে কামরার ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তে চাউর হয়ে গেল কথাটা। সুজয় চেঁচিয়ে বলছে, 'আপনারা কেউ ভয় পেয়ে নেমে যাবেন না—লোকটা জাল চেকার—আমি প্রমাণ পেয়েছি—সত্যিকারের চেকার হলে এই পনেরোই আগস্টের—'

সরিৎ সুজয়ের আটকে যাওয়া কথাগুলো সম্পূর্ণ করল, 'পনেরোই আগস্টের এই পুণ্যদিনে কয়েকজন গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়বার তাল করত না।'

গাড়ি ততক্ষণে স্টেশন থেকে সবে ছেড়েছে, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে যায়নি। চেকারটা হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে কনুইয়ের দুই ধাক্কায় সুজয় আর সরিৎকে সরিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেল। কিন্তু তখন আরো অনেকে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কেউ জামা, কেউ ঠ্যাং, কেউ হাত ধরে লোকটাকে হিড়হিড় করে টেনে আনল। আর পালাবার পথ নেই। গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গতি বাড়িয়েছে। একদল ক্রুদ্ধ যাত্রী লোকটাকে ঘিরে ফেলেছে। লোকটা তবু তড়পাচ্ছে—'জানেন, একজন অন ডিউটিতে থাকা গবরমেন্টের লোকের গায়ে হাত তোলার শাস্তি কী—'

একজন ফুট কাটল, 'অন ডিউটিতে থাকা আবার কেমন বাংরেজি চাঁদু? চলো আপ-টু ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত, তারপর তোমার হবে।'

লোকটাকে ধাক্কা মেরে মেরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। নইলে মগরা বা আদিসপ্তগ্রামে আবার পালাবার চেষ্টা করবে। ডামাডোলের মধ্যে লোকটার সাইডব্যাগ হাতড়ে সরিৎ একটা ছোরা পেয়েছে। সেটা বার করে সবাইকে দেখাল। সুতরাং আর সন্দেহই রইল না লোকটা দু-নম্বরি। ব্যাগের টুকিটাকি জিনিসের মধ্যে রেলের একটা নকল রসিদ-বইও পাওয়া গেল। নকল এইজন্যে যে, তাতে কোনো সিরিয়াল নম্বর নেই। পকেট-টকেট সার্চ করে অবশ্য বিপজ্জনক কিছু পাওয়া গেল না।

সুজয় সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'আমার প্রথমে সন্দেহ হয় লোকটার পোশাক দেখে। কালো জামার হাতায় লাল ফেট্টি জড়ানো চেকার আমি কোনোদিন দেখিনি, সিভিল ড্রেসের চেকিং স্টাফই ও-রকম কাপড় বাঁধে। সন্দেহটা বেড়ে গেল, যখন দেখলাম উনি বেছে বেছে নিরীহ লোকদের টিকিট দেখতে চাইছেন আর মাঝে-মাঝেই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। আমার কাছে আসতেই আমি ইচ্ছে করেই হাওড়া-শক্তিগড়ের পুরনো টিকিট দুটো হাতে দিলাম—শক্তিগড়ে ও-দুটো কেউ চায়নি বলে আমার পকেটেই ছিল। উনি সেই পুরনো টিকিটের ওপর দিব্যি সই করে দিলেন। সত্যিকারের চেকার হলে ধরে ফেলতেন। আসলে জাল মানুষদের মনে একটা দুশ্চিন্তা আর অপরাধবোধ থাকে, তার ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই অসাবধান হয়ে পড়ে। সবশেষে যখন দেখলাম, এমন একটা স্মরণীয় দিনেও উনি গরিব লোকের পয়সা খাচ্ছেন তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না।'

একজন সুজয়ের ভুল শুধরে দিল, 'উনি-ফুনি নয়, এসব লোককে তুই-তোকারি করা উচিত।'

সুজয় লাজুক হেসে বলল, 'সে যাই হোক।'

লোকটাকে জালিয়াতি, প্রতারণা, ভীতিপ্রদর্শন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ ইত্যাদির অভিযোগে ব্যাণ্ডেল জি· আর· পি-র হাতে তুলে দিয়ে আর কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে ওরা যখন ব্যাণ্ডেল লোকালে চাপল তখন রাত প্রায় সাড়ে-নটা। সুজয় সরিৎকে বলল, 'কাল কাগজে খবরটা বেরোয় কি না দেখতে হবে। দুই কিশোরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জাল টিকিট-চেকার ধরা পড়ল—বা ঐ ধরনের কিছু—'

সরিৎ বাধা দিয়ে বলল, 'দুই কিশোর আবার কোথায়, ধরলি তো তুই একাই।'

সুজয় বন্ধুর পিঠ চাপড়াল, 'দূর, তুই না থাকলে কি পারতাম?'

ছবি : অনুপ রায়

সুপার রিন
আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা
যা আর কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই।

সুপার রিন-এর দিকে আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখুন।
চমৎকার নতুন মোড়ক—আর, আহ্, অপূর্ব এক নতুন সুগন্ধ!

সুপার রিন-এর শুভ্রতার দিকে আর একটু
লক্ষ্য করে দেখুন।
সুপার রিন শুভ্রতার শক্তির ভরপুর এক ভাণ্ডার।
এ আপনাকে যোগায় বাড়তি শুভ্রতা, যা আর কোন
ডিটারজেন্ট ট্যাবলেটের সাধ্য নেই। আপনি নিজেই
দেখুন না— সুপার রিনে কাচা জামাকাপড় এমন ধবধবে
সাদা হয় যে সবার মাঝে লোকের নজর কেড়ে নেয়।

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS RIN 69 2416 BG

মোগল-দরবারে ইংরেজ ডাক্তার

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

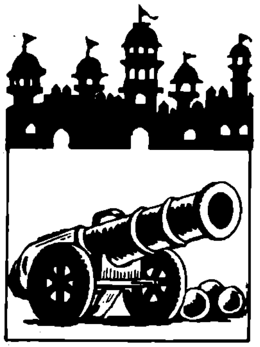

৪ জুলাই, ১৭১৫ সাল। দিল্লি শহরের বাইরে হুমায়ুনের সমাধির কাছে বাদশাহ ফররুখশিয়ারের একজন কর্মচারী ২০০০ সৈন্য ও দুটি হাতি নিয়ে সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা থেকে বাদশাহর কাছে দরবার করবার জন্য একটি ছোট দল পাঠিয়েছিলেন। সেই দলের সেদিন দিল্লি পৌঁছবার কথা। ইংরেজদের ইচ্ছা ছিল, তাদের যেন ভাল করে অভ্যর্থনা করা হয়, এবং ধুমধাম করে শহরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা যেন ধুলোপায়ে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে পারে। বাদশাহর সঙ্গে দেখা করে তারা যে যার থাকবার জায়গায় চলে যাবে।

তা ইংরেজদের তো বাজনা-টাজনা বাজিয়ে, শোভাযাত্রা করে দিল্লির লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল। পৌঁছতে বেলা প্রায় দুপুর। দরবারে ইংরেজরা বাদশাহর কাছে কলকাতার গভর্নরের চিঠি পেশ করলেন, ১০০১ মোহর নজরানা দিলেন। তার সঙ্গে আরও অনেক উপঢৌকন। ভালয় ভালয় ইংরাজরা কাজ আরম্ভ করলেন বটে, কিন্তু গোড়ায় গলদ ছিল, তাই শেষ রক্ষা হতে দেরি হল। সে-কথা বুঝতে হলে আগেকার কিছু ঘটনা জানা দরকার।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ সালে মারা গেলেন। ইংরেজরা তখন অনেকটা গুছিয়ে বসেছে। সম্পত্তি রক্ষা করতে গেলেই দুর্গ গড়তে হয়। দুর্গ রাখতে হলে অনেক টাকা খরচ। সে-টাকা কোথা থেকে আসবে ? তখন নতুন ব্যবসা। লাভও করব, এত খরচও করব, তা সম্ভব নয়। একটা বাড়তি উপায়ের ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়তি টাকা আসতে পারে, যদি দুর্গের কাছে অনেকটা জমি পাওয়া যায়। তার জন্য দিল্লির বাদশাহর অনুমতি দরকার। সুবে বাংলায় একজন শাসনকর্তা অবশ্যই ছিলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ। তাঁকে ইংরেজদের বন্ধু বলা চলে না। পরস্পরকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে ইংরেজরা এ নিয়ে কথা শুরু করে ; কিন্তু কাজ তখনও কিছু এগোয়নি। বাহাদুর শাহর পরে তাঁর বড় ছেলে জাহান্দার শাহ্ সম্রাট হয়েছিলেন। জাহান্দার শাহ্ কিন্তু ঠিক বাদশাহ হবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। এক বছরেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। তারপর জাহান্দার শাহর ভাই আজিম-উস্-সানের ছেলে ফররুখশিয়ার সম্রাট হলেন। তিনিও কোনো কোনো বিষয়ে একটু অদ্ভুত ছিলেন। তিনি ও তাঁর বাবা, দুজনেই ইংরেজদের পছন্দ করতেন। ফররুখশিয়ার বিলিতি খেলনা ভালবাসতেন। বড় হয়েও ফররুখশিয়ার খেলনার লোভ ছাড়তে পারেননি। ইংরেজদের মনে হয়েছিল, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সম্রাটকে কিছু বিলিতি খেলনা উপহার দিলে কাজের সুবিধা হতে পারে। ফররুখশিয়ারের রাজত্বের প্রথম দিক থেকে দিল্লিতে লোক পাঠাবার তোড়জোড় হচ্ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ এ ব্যাপার পছন্দ করছিলেন না। ইংরেজরা দিল্লি থেকে বাদশাহর হুকুম আনালেন যে, মুর্শিদকুলি খাঁ যেন কোনোভাবে তাঁদের বাধা না দেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে দিল্লিতে কাদের পাঠানো হবে, তাই নিয়ে কিছু আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যাঁরা কাউন্সিলের সদস্য, তাঁদের না-পাঠানোই ভাল। কে জানে, বাদশাহ কিংবা তাঁর ওমরাহরা তাঁদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবেন। শেষ পর্যন্ত যাঁদের পাঠানো হল, তাঁদের নাম জন্ সারমন, এডোয়ার্ড স্টিফেনসন, হিউ বারকার ও ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন। এঁদের মধ্যে জন সারমন এই দলের নেতৃত্ব করেন। কিন্তু দেখা গেল, ডাক্তার হ্যামিলটনকে দিয়েই কোম্পানির কাজ হয়েছে।

দরখাস্ত পেশ করতে হলে রীতি হচ্ছে উপযুক্ত মানের উপহার দিতে হয়। কোম্পানি অনেক ভেবে বাদশাহকে যে উপহার দেবেন ঠিক করেছিলেন, তার দাম এক লাখ দু' হাজার টাকার কিছু বেশি। দরবারের ওমরাহদের জন্য যেসব জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়া হল, তার দামও এক লাখ আট হাজার টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সারমন ও সঙ্গীদের খরচের জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। এই দলের সঙ্গে কিছু কাপড়চোপড় পাঠানো হল, যা বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। পথ-খরচার টাকার অভাব হবে না।

ইংরেজরা বাদশাহর দরবারের আদব-কায়দা ভাল করে জানতেন না। সেখানে সত্যিকারের কিছু ক্ষমতা ছিল যাঁদের, তাঁরা দুই ভাই, আবদাল্লা আর হুসেন। সমস্ত দরখাস্ত পেশ করতে হত উজির আবদাল্লা খানের কাছে। তাঁর বদলে ইংরেজরা যাঁর কাছে দরখাস্ত পেশ করেছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো ক্ষমতা ছিল না। ইতিমধ্যে আর-এক'বিপদ উপস্থিত হল। বাদশাহ ফররুখশিয়ারের স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভাল ছিল না। এই সময়েই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাদশাহর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল, কিন্তু অসুখের জন্য সে-তারিখ পিছিয়ে যেতে লাগল। দরবারের হাকিমরা কিছুই করতে পারলেন না। শেষে ওমরাহদের একজন বললেন, ইংরেজদের সঙ্গে তো একজন ডাক্তার আছে, তাকে দিয়েই বাদশাহর চিকিৎসা করানো যাক। এ-ব্যবস্থাও সবার ভাল লাগেনি। ইংরেজদের চিকিৎসায় বাদশাহ অসুখ সত্যি যদি সেরে যায়, তাহলে হাকিমরা তো মুখ দেখাতে পারবে না। একজন আবার বললেন যে, আগে একজন বড় কর্মচারীকে ওষুধ খাইয়ে দেখা যাক কী হয়। যাঁর নাম করা হল, তিনি বাদশাহর খান-ই-সামান। তিনি কিছুতেই ওষুধ খেতে রাজি হলেন না। যার অসুখ করেনি, তাকে ওষুধ খাইয়েই বা কী বোঝা যাবে ? অবশেষে ডাক্তার হ্যামিলটনকে ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় বাদশাহ ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠলেন, কিন্তু ঠিক সেরে উঠতে

আপনার দামী সেটে ভরে দিন জাপানের অদ্বিতীয় কারিগরী বিজ্ঞান নিপ্পো লাগান।

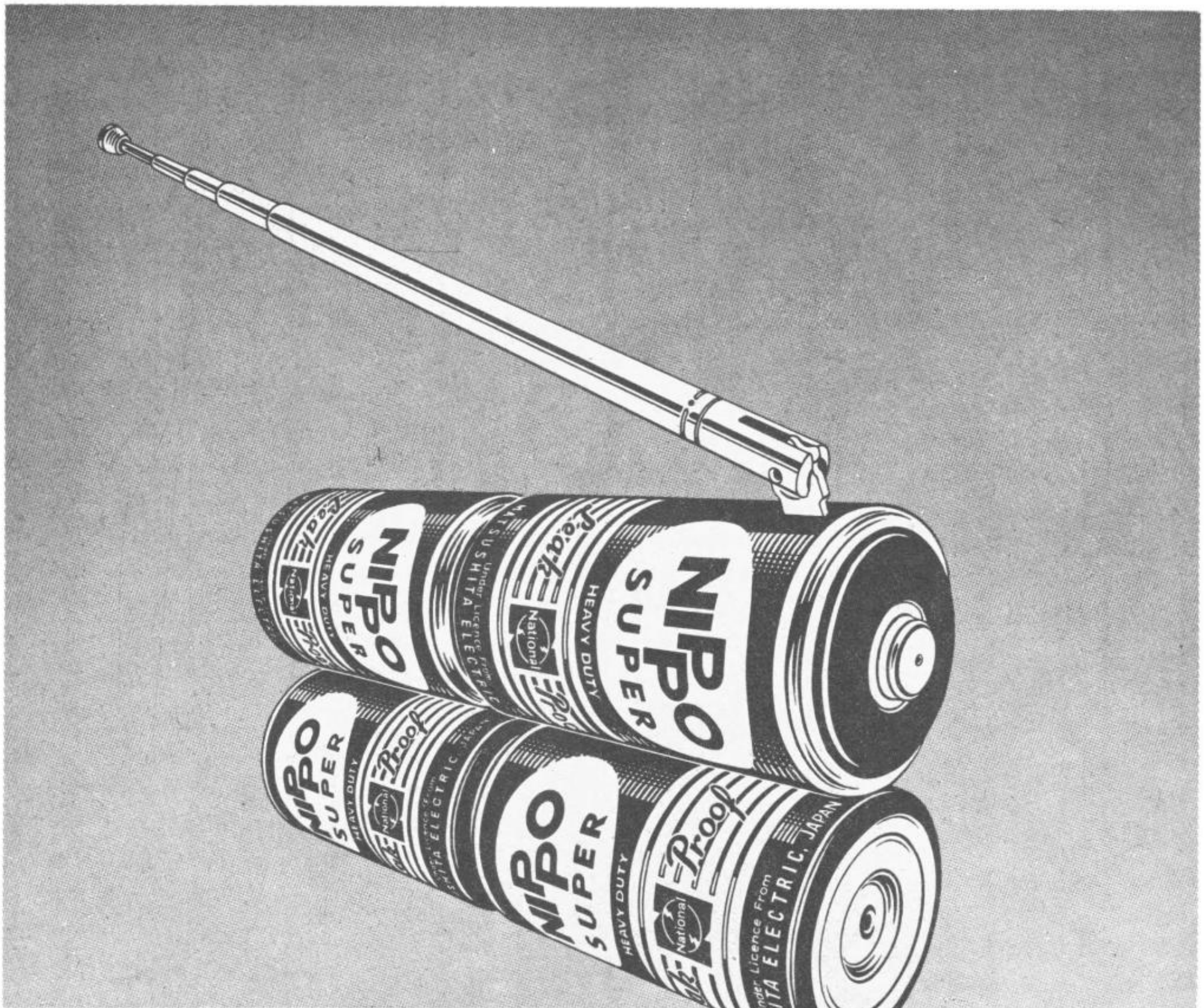

খাস জাপানের নামজাদা "ন্যাশনাল" মানেই বিশ্বের পয়লা নম্বর কারিগরী. তারাই বানায় নিপ্পো ব্যাটারি। আপনার কেনবার পক্ষে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ড্রাই সেল হল এগুলিই আপনি নিশ্চয় আপনার নামী দামী সরঞ্জামগুলিতে যে কোন অন্য ব্যাটারি ব্যবহার করতে ভরসাই পাবেন না ?

- উপরে সীলবন্ধ থাকাই গ্যারাণ্টি দেয় এ ফ্যাক্টরি থেকে সদ্য বেরনো টাট্‌কা শক্তি
- আই এস আই মার্কা আপনাকে দেয় সেরা গুণমানের প্রতিশ্রুতি
- ধাতু দিয়ে মোড়া বলে লীক করার ভয় থেকে পুরোপুরি সুরক্ষা
- প্রত্যেকটি ব্যাটারি আপনার হাতে পৌঁছয় খুঁটিয়ে পরীক্ষার পর

নির্ভরযোগ্য শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভার

- নিপ্পো হাই-টপ ● নিপ্পো সুপার
- নিপ্পো হাইপার ● নিপ্পো স্পেশাল
- নিপ্পো পেনলাইট

National নিপ্পো

ব্যাটারি

টেকনিক যার খাস জাপানের ন্যাশনাল হতে আর এর শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরি হয় ভারতে

everest/84/INL/139-bn.

মাস-দুই লাগল। তখন আবার বিয়ের ধুম লেগে গেল। ইংরেজরা আর বাদশাহর নাগাল পান না।

ইংরেজরা প্রথমে বুঝতে পারেননি যে, বাদশাহর কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হলে ঠিক লোকের হাতে দিতে হয়। সেই লোক বাদশাহর উজির। দরখাস্ত প্রথম পাঠানো হয়েছিল ১৭১৫ সালের আগস্ট মাসে। ইংরেজরা যা প্রার্থনা করেছিলেন, তা মোটামুটি এই : পূর্বে ইংরেজদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি যেন বজায় থাকে। অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় তাঁরা যেন অবাধে বাণিজ্য করতে পারেন। তার জন্য নামমাত্র কর দিলেই চলবে। তিনটি গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা তাঁরা খাজনা দিয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ দুটি পুরনো ব্যাপার। এই সুবিধা ইংরেজদের দেওয়াই হয়েছিল, কিন্তু বাদশাহর কাছ থেকে ফরমান পেলে ব্যাপারটা আরও পোক্ত হয়। ইংরেজরা নতুন করে চাইলেন, যেন এই তিনটি গ্রামের মতো কলকাতার কাছে আরও ৩৮টি গ্রাম তাঁদের এইরকম শর্তে দেওয়া হয়। তা ছাড়া চাওয়া হল পাটনার ফ্যাক্টরির জন্য ১৩ একর জমি।

আরও প্রস্তাব ছিল। কলকাতার নাম বদলে ফররুখ-বন্দর রাখা হবে, আর ৩৮টি গ্রাম ইংরেজদের দিলে তাঁরা তার সঙ্গে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতাকে যোগ করে গোটা এলাকাকে ফররুখাবাদ নাম দেবেন। বোধহয় মনে করা হয়েছিল, এইসব প্রস্তাবে বাদশাহ খুশি হবেন। কিন্তু কলকাতার নাম বদলে ফররুখ-বন্দর করা কিংবা ফররুখাবাদ নামে একটি আলাদা পরগনা করার প্রস্তাবে বাদশাহ রাজি হলেন না। ভাবলেন, এতে পরে অনেক অসুবিধা হতে পারে। ইংরেজরা আশা করেছিলেন যে, বাদশাহ দরখাস্ত হাতে পেলেই ফরমান জারি করে দেবেন। তা কিন্তু হল না।

পরের বছর জানুয়ারি মাসের শেষে ইংরেজরা আর-একটি দরখাস্ত করলেন। দ্বিতীয় দরখাস্তে দুটি নতুন প্রার্থনা ছিল। একটি হচ্ছে ইংরেজদের যেন বোম্বাইতে একটি টাঁকশাল করতে দেওয়া হয়। আর একটিতে বলা হয়েছিল যে, কলকাতায় দুর্বৃত্তরা এসে খুব উপদ্রব করে, তাদের যেন দমন করবার ব্যবস্থা হয়। প্রায় তিন মাস অপেক্ষা করার পর মার্চ মাসে ইংরেজদের দ্বিতীয় দরখাস্ত ফেরত দেওয়া হল। বলা হল, ওটা উজিরের হাত দিয়ে আসা উচিত, নাহলে কিছু করা যাবে না। পরের বছর ইংরেজরা উজিরের হাত দিয়ে তৃতীয় দরখাস্ত পাঠালেন। এবার তাড়াতাড়ি কাজ হতে লাগল। বাদশাহকে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজরা বিরক্ত হয়ে সুরাটের ব্যবসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারেন। ইংরেজদের সুরাটের ব্যবসায় বাদশাহের বেশ লাভ হত। অবশেষে ১৭১৭ সালে বাদশাহ ফরমান জারি করলেন। সেই ফরমানে বাদশাহের মোহরের ছাপ পড়ল। তারপর উজিরের মোহর পড়ল। কিন্তু মে মাসের আগে ইংরেজরা দিল্লি ছাড়তে পারলেন না। ইতিমধ্যেই দু পক্ষের কিছু উপহার দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। ফররুখশিয়ার খুব ভালবাসতেন ঘোড়া। তিনি সারমনকে অন্য জিনিসের সঙ্গে একটি ঘোড়া উপহার দিলেন। শেষ মুহূর্তে আবার একটি বিপদ ঘটতে পারত। বাদশাহকে কেউ কেউ বুঝিয়েছিলেন যে, ডাক্তার তো ফিরে যাবেন, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাদশাহর আবার অসুখ হলে কী হবে? ডাক্তার হ্যামিলটনকে রেখে দেওয়া হোক। ডাক্তার হ্যামিলটন এই

বলে ছাড়া পান যে, তিনি বিলেত গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর বাদশাহর জন্য ভাল ওষুধ যোগাড় করে পাঠাবেন। এর পর বাদশাহ আর আপত্তি করলেন না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে ফরমান দেওয়া হয়েছে, এ খবর আগেই কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও চারজন সদস্য কলকাতা থেকে কিছু দূরে ত্রিবেণীতে এসে সারমন ও তাঁর সঙ্গীদের অভ্যর্থনা করলেন। সারমন যে-সব প্রার্থনা করেছিলেন, তার সব বাদশাহ মঞ্জুর করেননি। কিন্তু অনেকগুলি করেছিলেন। ইংরেজরা আগেকার মতো বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ব্যবসা করতে পারবে। তার জন্য তিন হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু দিতে হবে না। কলকাতার চারদিকে তাদের অনেকটা জায়গা দেওয়া হল। হায়দরাবাদেও আগেকার মতন ব্যবসা চলবে। যা কর তারা দিত, শুধু তাই দিতে হবে। সুরাটে সবরকম কর ও মাশুলের বদলে বছরে তারা ১০ হাজার টাকা দেবে। বোম্বাইতে টাঁকশালে যে টাকা ছাপা হবে, তা সাম্রাজ্যের সব জায়গায় চলবে।

একশো বছর আগে জাহাঙ্গিরের আমল থেকে ইংরেজরা ব্যবসা করবার অনুমতি ও নানারকম সুবিধা খুঁজছিল। কিন্তু বাদশারা যা-ই বলুন না কেন, তখন যাঁরা প্রদেশের সুবেদার ছিলেন, তাঁদের উপরে অনেকটা নির্ভর করত। সুবেদারের হাত শক্ত থাকলে তাঁরা বিদেশীদের অনেকভাবে বাধা দিতে পারতেন। দিল্লি অনেক দূরের পথ। তা ছাড়া দিল্লির বাদশাহের সিংহাসন এত টলমল করত যে, সুবেদারকে চটিয়ে ইংরেজদের কোনো লাভ হত না। পলাশির যুদ্ধে জিতে ইংরেজদের অনেক সুবিধা হল বটে, কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ আরও কয়েক বছর ধরে লেগেই রইল। তার অনেক আগেই ফররুখশিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। পরে যাঁরা বাদশা হলেন, তাঁদের শাসন তো নামেমাত্র শাসন। তাঁদের মর্জিমতন কাজ-কারবার করার কোনো দরকারই ইংরেজদের ছিল না।

ছবি : অনুপ রায়

বিমল মিত্রের ছোটদের উপন্যাস

বিমল মিত্র সেই ধরনের লেখক গল্প বলায় যাঁদের জুড়ি পাওয়া ভার। গল্পের কতটুকু কখন বললে পাঠকের মনে হবে, আরও শুনব, এক্ষুনি শুনব, তা তিনি জানেন। আর জানেন বলেই তাঁর গল্পের বা উপন্যাসের মধ্যে সব সময় একটা আলাদা রকমের দুর্বার আকর্ষণ লুকিয়ে থাকে।
বিমল মিত্র বড়দের মহলে তো দারুণ জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু ছোটদের জন্যও যে-কটি উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং স্বাদে মন-কেড়ে-নেওয়া।
যেমন ধরো, রাজা হওয়ার ঝকমারি। এক রাজা ঠিক করলেন যে, পৃথিবীর সব-থেকে বোকা লোকটিকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, তাকেই তিনি বসাবেন নিজের সিংহাসনে। রাজার দুই ছেলে। দুজনেই ছুটল—এ-প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত। তারপর ? তারপর যে কী, তাই নিয়েই রাজা হওয়ার ঝকমারি'।
দাশরথির বাহাদুরি'তে বিমল মিত্র শুনিয়েছেন একটি ছেলের মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরভক্তিতে অটল থেকে বড় হবার এক অসাধারণ কাহিনী। সেই ছেলেটির নাম দাশরথি। এ-কাহিনী শুধু গল্পের ক্ষিদেই মেটাবে না, অনুপ্রাণিতও করবে তোমাদের।
আবার ধরো, তাঁর 'কে ?' নামের উৎকণ্ঠা-উদ্বেল মহান উপন্যাসটি। এক চেহারার দুই ছেলেকে নিয়ে কীসব গোলমেলে কাণ্ড। অসংখ্য দাবিদার, অজস্র জটিলতা। আর এ-সবের জট ছাড়িয়ে দারুণ রোমাঞ্চকর ও দারুণ নাটকীয় একটি কাহিনী শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত চোখের সামনে। এই উপন্যাসের মধ্যে মানুষের আত্মপরিচয় অন্বেষণের একটি মহান বক্তব্যও খুব সূক্ষ্মভাবে মিশে রয়েছে।

বিমল মিত্রের বই

রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮·০০
দাশরথির বাহাদুরি ১০·০০
কে ? ১৫·০০

আরো অনেক লেখকের অনেক মন-মাতানো বইয়ের জন্য চলে এসো আনন্দ পাবলিশার্স-এর সেই বইয়ের দোকানে ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ঠিকানায় যে-দোকান কিনা শুধু ছোটদের জন্য

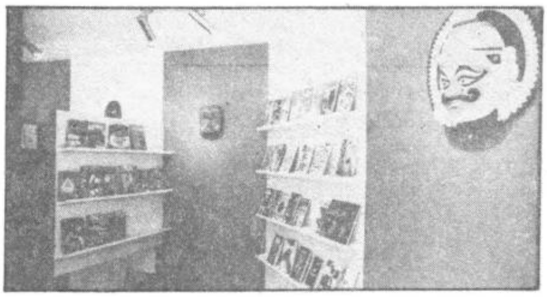

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

যদি কেউ কখনও এসে আমার কাছ থেকে পৃথিবীর সেরা দশজন বোলারের নাম শুনতে চায়, আমি চট করে উত্তর দিতে পারব না। আমার এই সহজ স্বীকারোক্তিকে কেউ অন্যভাবে নিতে চাইলে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু যা সত্য তাই বললাম। দশজন সেরা পেসারের তালিকা তৈরি করতে গিয়ে আমার বেশ কিছু সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করলে উঠে আসবেন অনেকেই, কিন্তু তাঁদের ভেতর থেকে প্রথম দশজনকে বেছে নেওয়া সত্যিই বেশ কঠিন কাজ। তবু চোখ বুজে কয়েকজনের নাম তো গোড়াতেই লিখে ফেলা যায়। যেমন লিণ্ডওয়াল, যেমন লারউড, লিলি। ল-এর অনুপ্রাসে তিনটি বিশ্ববন্দিত নাম—যাঁদের দক্ষতা জিজ্ঞাসার অতীত। এঁদের জন্য কোনোরকম ওকালতি করার প্রয়োজন আছে কী ? বোধ হয় না। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে বসেই তালিকা তৈরি করা হোক না কেন, আমার মনে হয় এঁরা আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবেনই।

ঠিক একইভাবে নির্বাচন পাবেন মিশমিশে কালো রঙের একটি মানুষ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বুক-কাঁপানো ফাস্ট বোলার—ওয়েসলি হল। আটান্নর নভেম্বর মাসের শেষদিকে টেস্টে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল এই ভারতবর্ষের মাটিতে। বোম্বাইতে, মরসুমের প্রথম টেস্টের জন্য অধিনায়ক গেরি আলেকজাণ্ডার যে এগারোজনের নাম ঘোষণা করেছিলেন সেই তালিকায় দুটি নতুন মুখ ছিল। বেসিল বুচার ও ওয়েসলি হল। প্রথমজন আক্রমণাত্মক ভঙ্গির ব্যাটসম্যান, দ্বিতীয়জন উঁচুজাতের ফাস্ট বোলার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এঁরা ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুটি নতুন উপহার। বেসিল বুচার এবং ওয়েসলি হল দুজনেই ক্রিকেটে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে, সে-কথা তোমরা সকলেই জানো। '৫৮ থেকে '৬৯—এই এগারো বছর ধরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই প্রধান শক্তি ছিলেন ওঁরা দু'জন।

বোম্বাইতে হল সম্পর্কে রোহন কানহাই বলেছিলেন, "সরেস চিজ। মালুম হয়েছে নিশ্চয়ই ?" সে কি আর বলতে ! টেস্টে তাঁর হাতেখড়ির আগেই আমরা টের পেয়েছিলাম। ইয়া চেহারা। বিরাট লম্বা। মানানসই প্রস্থ। দেখলে সর্বদা মনে হত আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছেন বোলারটি। অনেকটা দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠতেন বোলিং ক্রিজের সামনে। চোখেমুখে ব্যাটসম্যানের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ! মাটিতে পড়ে বল ছুঁড়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত মনে হত, মেঘের আড়াল ভেঙে আকাশ থেকে নেমে আসছে বিশাল এক কালো দৈত্য। সব কিছু একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে।

দানবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া গোলাটির গতি ছিল ক্ষিপ্রতম। শুধু তাই নয়, প্রাণান্তকর বদ-রসিকতা করতেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। উইকেট ছাড়াও মাঝে-মাঝে রক্তবর্ণ গোলকটির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠত ব্যাটসম্যানের উর্ধ্বাঙ্গ। ব্যাটসম্যানকে কেবল ভুল খেলতে বাধ্য করলে বা শুধু গতি দিয়ে ঠকালেই চলে না, তাঁকে একটু-আধটু ভয়ও দেখাতে হয়। এ-কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন হল। সুতরাং, সব সময় মারাত্মক বাউন্সারের আশঙ্কায় থাকতেন বিপক্ষের ব্যাটসম্যানরা।

"এই শঙ্কাকে আমি বেশ হৃষ্টচিত্তে উপভোগ করতাম। প্রচুর আনন্দ পেতাম তাতে। আর বলতে সঙ্কোচ নেই, আত্মপ্রসাদও লাভ করা যেত যথেষ্ট। বেশ লাগত তখন। চমৎকার একটা ফুরফুরে অনুভূতি। একজন ফাস্ট বোলারের কাছে এমন অনুভূতির কোনো বিকল্প নেই।" পরে ওয়েসলি হল খোলা মনে মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু প্রতিহিংসা ? তা বোধ হয় হলের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি। হল তো আর গিলক্রিস্ট নন। গিলক্রিস্টের বোধ হয় রক্তপানেও অরুচি ছিল না। হলের ছিল উইকেট-তৃষ্ণা। গিলক্রিস্ট বদরাগী, ধৈর্যহারা মানুষ। আর হল ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে একেবারে উলটো ধাঁচের মানুষ। ঠাণ্ডা মাথায়, রয়ে-সয়ে নিজের শক্তির সদ্ব্যবহার করেন। তা বলে তাঁকে তোমরা আবার কুলপির মতো ঠাণ্ডা মানুষ বলে ভেবো না। একজন ফাস্ট বোলার, যথার্থই একজন ফাস্ট বোলার কখনও বরফ-ঠাণ্ডা মেজাজের হতে পারে না। অন্তত আমি এমন মানুষ খেলোয়াড়জীবনে কখনও দেখিনি। দুর্লভ ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।

ভেতরে তেজ, প্রতিজ্ঞা, উদ্দেশ্যসিদ্ধির চরম আকাঙ্ক্ষা আর শক্তির প্রকাশ গনগনে আগুনের মতো না হলে ভুবনজয়ী গতি আসবে কী করে ? সুতরাং, পেস বোলাররা চরিত্রে কিছুটা উগ্র হবেনই। কিন্তু উগ্রতারও তো রকমফের আছে। গিলক্রিস্টের উগ্রতা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। হল ব্যাটসম্যানের পারদর্শিতার প্রশংসা করতে জানতেন। গিলক্রিস্ট নিজেকে ভিন্ন আর কাউকে দেখতে চাননি, জানতেও চাইতেন না। (ক্রমশ)

ওয়েসলি হল (দুরন্ত গতি এখন শান্ত)

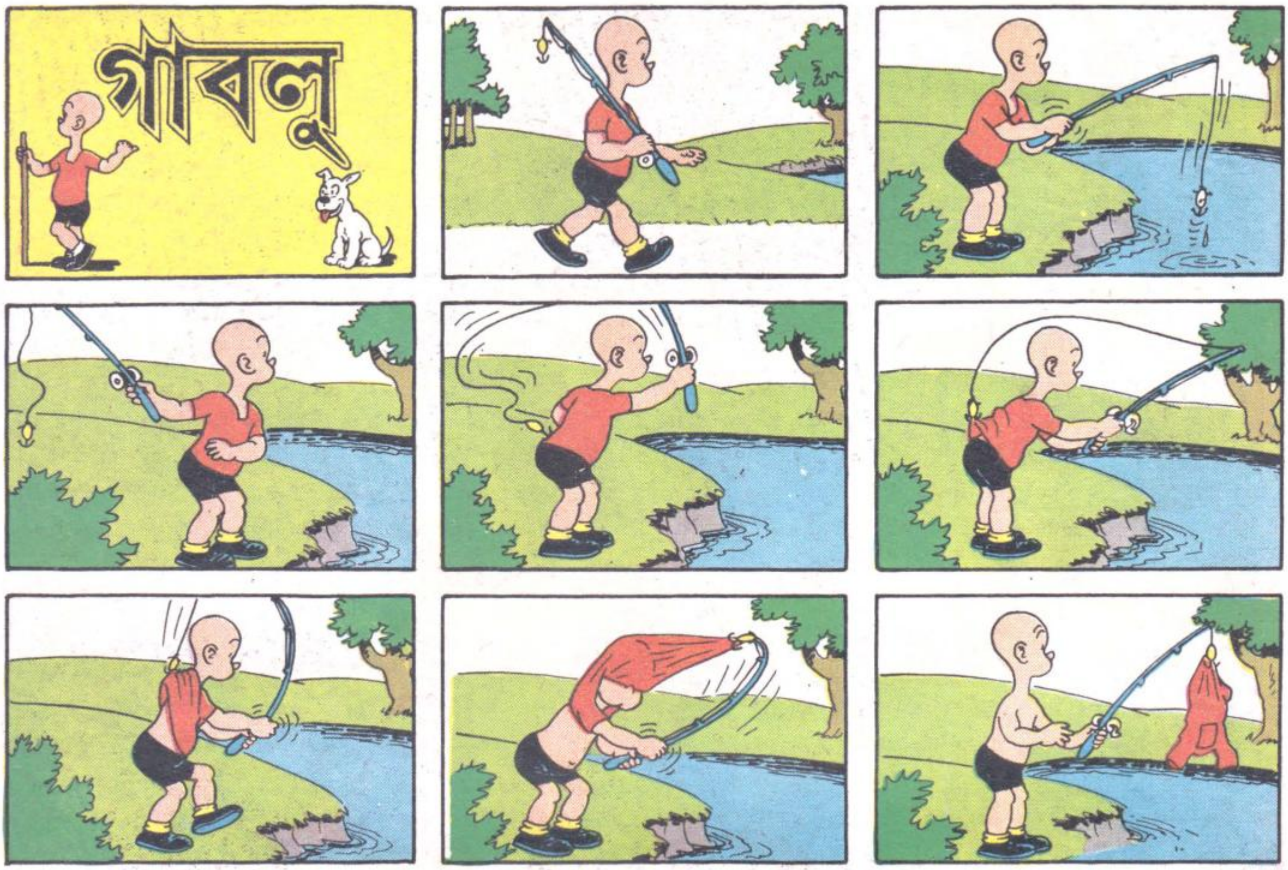
গাবলু

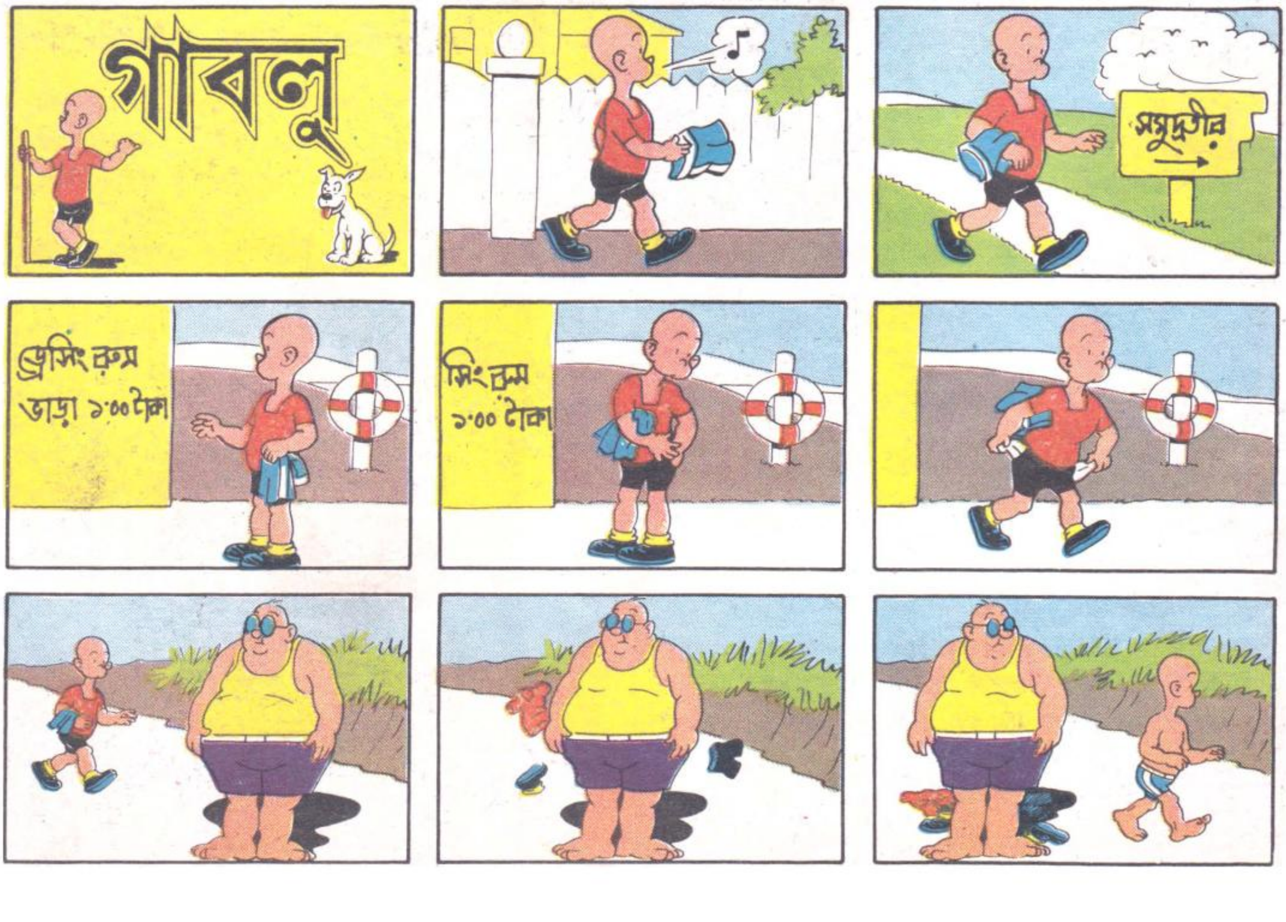
গাবলু
সমুদ্রতীর
ড্রেসিং রুম
ভাড়া ১·০০ টাকা
সিং রুম
১·০০ টাকা

ফ্ল্যাশ গর্ডন
তুমি নেমে যাও ভালটান ! মরতে হয় তো আমি একাই মরব !
তা হয় না, ফ্ল্যাশ !
পৃথিবীর আয়ু আর মাত্র কয়েক মিনিট ! তুমি নেমে গেলে আমার কাজের সুবিধেই হবে !
বেশ, তাহলে চললুম !
চতুর্দিকে প্রচণ্ড কোলাহল ...
ফ্ল্যাশ আসছে ?
বিধ্বস্ত অবস্থায় নেমে আসছে ফ্ল্যাশের রকেট !
পৃথিবীর আয়ু আর ছ'মিনিট !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

তিন প্রধানের লিগ-সেনারা

সম্রাট রায়

লিগ জয়ের প্রশ্নে মোহনবাগান ক্রমেই একটা দূরত্ব গড়ে নিল ইস্টবেঙ্গল মহমেডানের থেকে। প্রতি ম্যাচেই একটু-একটু করে লিগ-খেতাব সরিয়ে নিল নিরাপদ জায়গায়। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন জয়ের হাওয়ায় কার পতাকা উড়ছে, তা তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে গেছ।

লিগের সম্মান মুঠোয় পুরেও মোহনবাগান কিন্তু খুশি নয়। কারণ, কাগজে-কলমে সব-সেরা দল হয়েও মোহনবাগান কখনই চ্যাম্পিয়নের মতো খেলতে পারেনি। দেশের সবচেয়ে নামী মিড-ফিল্ডার প্রশান্ত ব্যানার্জিকে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে দলে এনেও তাঁর পায়ের 'জাদু' দেখার সুযোগ পেল

বাবু মানি (মোহনবাগান)

সাব্বির (মহমেডান)

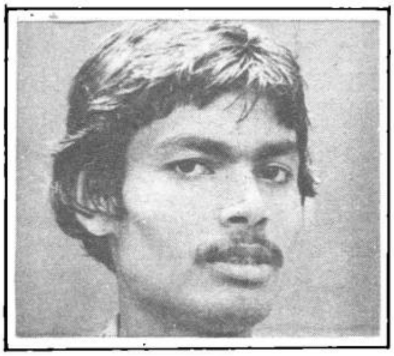

তরুণ দে (ইস্টবেঙ্গল)

না মোহনবাগান-সমর্থকরা। অন্য দুই মিড্‌ফিল্ডার ফরিদ এবং অমলরাজ আঘাত এবং ফর্মের ঘাটতিতে প্রয়োজন মেটাতে পারেননি। গোটা মরসুম মাঝ-মাঠকে সচল রেখেছেন অক্লান্ত **সুযশ** বেরা এবং বিকাশ পাঁজি। চোট-আঘাতের কারণে মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইনে 'ভয়ংকর' শব্দটি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। তবু ওরই মধ্যে বেছে নিতে কষ্ট হয় না সেই ধারালো অস্ত্রটিকে, যাঁর নাম বাবু মানি। কোচ পি কে ব্যানার্জির মতে 'এইমুহূর্তে মানি ভারতের সেরা উইঙ্গার'। আর নজর কেড়েছেন কৃশানু দে। বড় ম্যাচেও কৃশানু পায়ের টুকরো কাজে বিপক্ষ রক্ষণকে হেলায় টপকেছেন।

লিগে মোহনবাগানের কাছে হার মানার আগে পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল লাল-হলুদ জার্সির রঙের মতোই জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় 'ফেল' করার পর থেকেই ইস্টবেঙ্গল লিগ ফুটবলে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা কে কেমন খেলেছেন? এই প্রশ্নের শুরু যদি গোলকিপার থেকে আরম্ভ করতে হয়, তাহলে বলতেই হবে, মহমেডানের বিরুদ্ধে বড় ম্যাচে যে গোল ভাস্কর খেয়েছেন, তাতে অন্তত এই মরসুমে তিনি সেরা ফর্মে আছেন বলে মেনে নেওয়া শক্ত। ইস্টবেঙ্গলের ডিপ-ডিফেন্সে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং তরুণ দে ছিলেন দলের দুই মজবুত মিনার। বিপক্ষ ফরোয়ার্ডের চাপে নয়, সাইড-ব্যাক অলোক মুখার্জি কাবু ছিলেন আলসারে। 'বল-প্লেয়ার' বলতে যা বোঝায়, সেইরকম কেউই ইস্টবেঙ্গলের মাঝ-মাঠে ছিলেন না। কিন্তু ছিলেন বয়স্ক গৌতম, মিহির এবং উঠতি সুনির্মল চক্রবর্তী। প্রতি ম্যাচেই মাঠ জুড়ে পরিশ্রম করেছেন ওঁরা। এবং এই তিন সেলের টর্চে আলোকিত থেকেছে ইস্টবেঙ্গলের মধ্যমাঠ। ফরোয়ার্ড লাইনে দেবাশিস রায় এবং বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য গোল করার নেশায় থেকেছেন।

মহমেডানের সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট গোলকিপার। নেহরু কাপে ভারতের এক নম্বর জার্সি পরার পর থেকেই অতনু ভট্টাচার্য প্রায় প্রতি ম্যাচেই প্রমাণ রেখেছেন বারের নীচে তিনি ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছেন। দুটি বড় ম্যাচেও অতনু ছিলেন অদ্বিতীয়। পেম দোরজি, প্রেমনাথ ফিলিপ এবং মইদুল ইসলাম ছিলেন ডিফেন্সের পাহারায়। কিন্তু চাপের মুখে পাহারাদারদের যে অটল দেখা যায়নি, তার প্রধান কারণ, ওঁরা প্রত্যেকেই স্লো ফুটবলার। যোগ্য পার্টনারের অভাব নিয়েও মিড-ফিল্ডার হিসেবে প্রসূন দায়িত্ব পালন করেছেন। ফরোয়ার্ড লাইনে গতিময় ফুটবল খেলেছেন সুবীর সরকার। এখনও ভারতের এক নম্বর স্ট্রাইকারটি সাব্বির আলিই। পেনাল্টি-বক্সে সাব্বিরের মাথা এখনও ভাসানো সেন্টারে গোলের গন্ধ পেলেই ছিটকে ওঠে বিপজ্জনকভাবে।

বিজয়-রমেশ জ্বলে উঠে নিবে গেল

অশোক রায়

পরপর তিন দিন একই ঘটনা ঘটল। সকালে চায়ের কাপ পাশে রেখে খবরের কাগজটা খুলেই চোখ আটকে গেল খেলার পাতায়। একটা সকালকে চমকে দেবার মতোই খবর। ভুবনজয়ী ভূলুণ্ঠিত। প্রথমবার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। তাই খবরের গভীরে দ্বিতীয়বার চোখ নামাতেই হল। এ টি পি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউণ্ডেই বিশ্বের এক নম্বর টেনিস সুপার-স্টার জন ম্যাকেনরো কুপোকাত। হ্যাঁ, সেই ম্যাকেনরো, কটা দিন আগে উইম্বলডন ফাইনালে যিনি জিমি কোনর্সকে বাদামের খোসার মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। উইম্বলডন ফাইনাল সরাসরি দেখা গিয়েছিল বলেই আমরা জানতে পেরেছিলাম ওই দিন ম্যাকেনরো যেরকম খুনে-মেজাজে ছিলেন তাতে টেনিস-দেবতাকেও মেঘের আড়াল থেকে লুকিয়ে যুদ্ধ করতে হত। আসলে, মেজাজি ম্যাকেনরো এই মুহূর্তে টেনিস-বিশ্বে যে ইমেজ গড়ে নিয়েছেন সেটা প্রায় এভারেস্টের উচ্চতার কাছাকাছি। তাই তাঁকে হারানোর কথা স্বপ্নেও চিন্তা করা শক্ত। কিন্তু তেমনই ঘটনা ঘটেছে। এবং অঘটনের নায়ক আমাদেরই বিজয় অমৃতরাজ। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে সত্তরতম স্থানের অধিকারী বিজয় বিশ্বের এক নম্বর জন ম্যাকেনরোকে ৬-৭, ৬-২, ৬-৩ সেটে হারিয়ে দিলেন। সারা ম্যাচে সাতবার 'এস' সার্ভিস করে, চমৎকার রিটার্ন পাঠিয়ে ম্যাকেনরোকে হতচকিত করে বিজয় সেই খেলাকে তুলে আনলেন, যা দেখে একদা মুগ্ধ ভারতবাসী কল্পনায় টেনিসের অনেক সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। সত্যি বলতে কী, বাচেন্দ্রি পালের পর বিজয়ের এই জয়ের খবর পড়তে-পড়তে এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, কাপে চুমুক দিয়ে দেখি চা জুড়িয়ে জল।

পরের দিনও টেনিস আবার চোখ টানল। এবং ঘটনার বিহ্বলতায় এদিনও চা জুড়িয়ে গেল অজান্তে। ম্যাকেনরো-জয়ী বিজয়কে জয় করলেন আর এক ভারতীয়, রমেশ কৃষ্ণন। ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে দুই ভারতীয় ভিন্ন মতাদর্শের টেনিস ঘরানাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যাশায় লড়াইয়ে নামলেন। রমেশের বাবা রমানাথন কৃষ্ণন ভারতীয় টেনিসের এক সম্ভ্রান্ত নাম। বাহারি মারের বৈচিত্র্যে, শিল্পের লাবণ্যে রমানাথন কৃষ্ণন একসময় মুগ্ধ করতেন টেনিস-অনুরাগীদের! টেনিসের সঙ্গে 'আর্টে'র সেতুবন্ধন ঘটেছিল কৃষ্ণনের খেলায়। অমৃতরাজ-ভাইরা ভারতীয় টেনিসে আনলেন 'শক্তি'। পাওয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল ভারতীয় টেনিসের। সুতরাং বিজয় এবং রমানাথন-তনয় রমেশের লড়াই ছিল ঘরানার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। সেই লড়াইয়ে আপাতত এগিয়ে রইলেন রমেশ ৬-২, ৪-৬, ৬-২ সেটে বিজয়কে হারিয়ে। ক্লান্ত, অবসন্ন বিজয়কে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

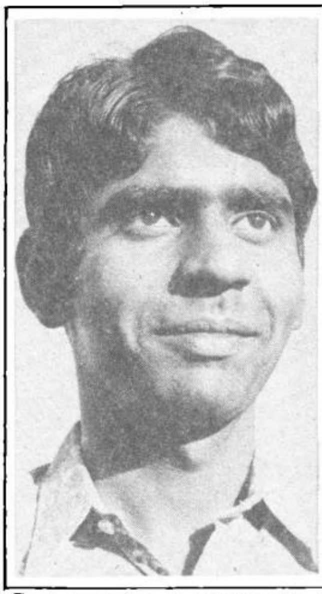
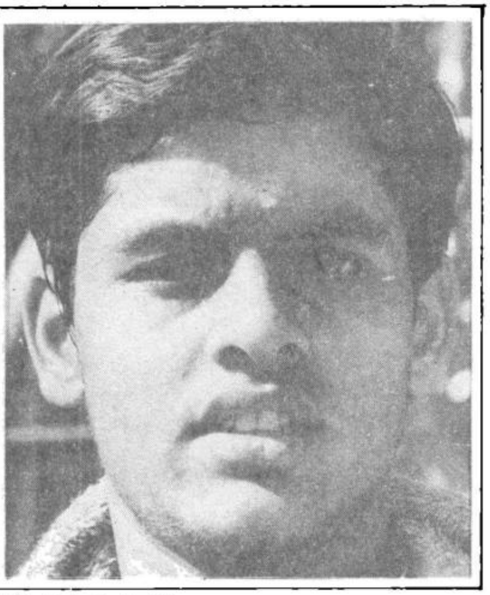

বিজয় অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণন (দুই ঘরানার লড়াই)

ম্যাকেনরো (বিজয়ের কাছে পরাজয়)

তৃতীয় সকালেও খবরের কাগজ খোলার আগে পর্যন্ত মনে ছিল আশা এবং পাশে ছিল চায়ের কাপ। ম্যাকেনরো-জয়ী বিজয়কে জয় করার ফলে রমেশকে ঘিরে একটা প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কাগজ খুলেই চমক। অস্ট্রেলিয়ার পল ম্যাকনেমি টাই-ব্রেকারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন রমেশকে, সেই সঙ্গে আমাদের সব স্বপ্নকেও। বিশ্বাস হচ্ছিল না। খবরের হেডলাইনটা আর একবার পড়লাম। নিজের কানেই হাহাকারের মতো শোনাল শব্দগুলো। কত অল্পেই ফুরিয়ে গেল একটা বিশ্বাস। ধারাবাহিকতার অভাবে টেনিসের কত সযত্ন-লালিত স্বপ্ন ভেঙে গেছে এভাবেই।

ভারশূন্য ভারতীয় টেনিসের কথা ভাবতে ভাবতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেখলাম, আজও চা জুড়িয়ে জল।

অতুলনীয় ইয়ান বথাম

সুব্রত সিংহ

টেস্ট ক্রিকেটের আসরে একটি নজিরহীন নজির সৃষ্টি হল তখনই, যখন আমাদের মন বা দৃষ্টি পড়ে ছিল বিশ্বের বিশালতম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ওলিম্পিকের আসরে। গুরুত্বের দিক দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের তুলনায় ওলিম্পিক নিঃসন্দেহে অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং ওই মুহূর্তে ক্রিকেটের মাঠে নয়, আমাদের দৃষ্টি ওলিম্পিকের প্রতি নিবদ্ধ থাকাই ছিল স্বাভাবিক। তাই কিছুটা যেন আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সদ্য-সমাপ্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজে আরও একটি নতুন রেকর্ড ক্রিকেটের রেকর্ডবইতে তালিকাভুক্ত হল।

টেস্ট ক্রিকেটে 'ডবল' (১০০০ বা ততোধিক রান ও ১০০ বা ততোধিক উইকেট) বা 'ডবলের ডবল' (২০০০ বা ততোধিক রান ও ২০০ বা ততোধিক উইকেট) করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। কিন্তু ৩০০০ বা ততোধিক রান ও ৩০০ বা ততোধিক উইকেট নেওয়ার দুর্লভ সম্মান ১০৭ বছরের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত কোনো ক্রিকেটারই অর্জন করতে পারেননি। এই টেস্ট সিরিজে সেই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন ইংল্যাণ্ড তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার ইয়ান বথাম তাঁর জীবনের ৭২তম টেস্টে।

এই টেস্ট সিরিজে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয় পরাজয় ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটপ্রেমীদের মনকে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত করে তুললেও বথামের এই অসাধারণ কৃতিত্ব অন্তত তাঁদের কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছে।

এই অসাধারণ অলরাউণ্ডারের প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, টেস্ট ক্রিকেটের আসরে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকেই যেভাবে তিনি একের পর এক্ নজির সৃষ্টি করে চলেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, টেস্ট ক্রিকেটের আসরে বথাম তাঁর অন্যতম তিন প্রতিদ্বন্দ্বী কপিলদেব, ইমরান খাঁ ও রিচার্ড হেডলির তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন। ওই চারজনই বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অলরাউণ্ডার। কিন্তু নজিরসৃষ্টির ক্ষেত্রে বথামের কৃতিত্ব বাকি তিনজনের কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গেছে।

সবচেয়ে কম টেস্ট খেলে 'ডবল' ও 'ডবলের ডবল' করার গৌরবটি অর্জন করেছেন এই বথামই। মাত্র ২১টি টেস্টে 'ডবল' করে তিনি ভারতের প্রয়াত অলরাউণ্ডার ভিনু মাঁকড়ের ২৩টি টেস্টে 'ডবল' করার রেকর্ড ভেঙেছেন। তাঁর 'ডবলের ডবল' করার কৃতিত্বও টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম। এই কৃতিত্ব অর্জন করতে বথামের লেগেছিল মাত্র ৪২টি টেস্ট। আর তাঁর সর্বশেষ নজির সৃষ্টি নিয়ে তো আগেই আলোচনা করেছি।

দুটি টেস্ট সিরিজে (১৯৭৮ ও ১৯৮১) পাঁচ শতাধিক রান ও পঞ্চাশটির বেশি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করা। টেস্ট ক্রিকেটে পঞ্চম খেলোয়াড় হিসাবে তিনশোর বেশি উইকেট নেওয়া ইত্যাদি এমন বহু নজির সৃষ্টি করে বথাম আজ সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। তাঁর অসাধারণত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে অতীতের চৌখস অলরাউণ্ডার অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার বলেছিলেন, "ভাগ্য ভাল যে, আমাদের সময়ে বথামের মতো এত দক্ষ একজন অলরাউণ্ডার ইংল্যাণ্ড দলে ছিলেন না।" এমনই আরও অনেকের দ্বারা অনেকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন বথাম। এগুলি তাঁর ক্রিকেট-জীবনের বাড়তি পুরস্কার বটে।

এই শীতে ইংল্যাণ্ড দল ভারত-সফরে আসছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই দলে আমরা এই অতুলনীয় অলরাউণ্ডারটিকে দেখতে পাব না। বথাম বলেছেন, দীর্ঘ দিন একটানা টেস্ট খেলার একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে আরও ভালভাবে তৈরি করে নিতেই তিনি এই সফরে আসছেন না।

ইয়ান বথাম (৩০০০ রান, ৩০০ উইকেট)

উইলিসের অবসর

মণি শর্মা

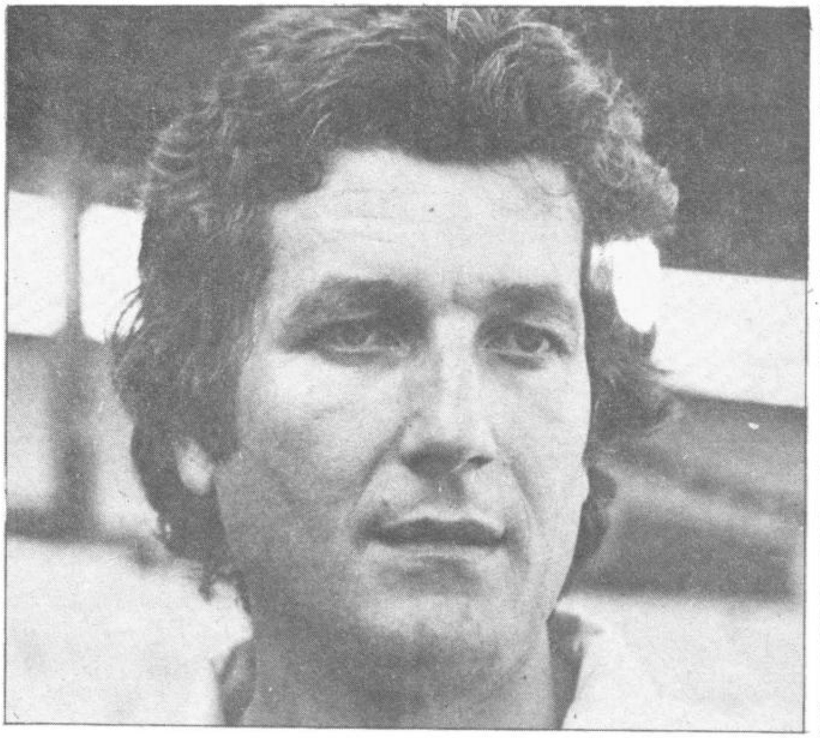

যতদিন ডেনিস লিলি টেস্ট খেলছিলেন, ততদিন সমস্ত মানুষের দৃষ্টি মূলত তাঁকেই অনুসরণ করত। শিকার সংগ্রহের রেকর্ড-মিনারটি তিনি আর কত উঁচু করতে পারেন, এটাই ছিল দেখার বিষয়। ৩৫৫টি উইকেট পাওয়ার পর একদিন হঠাৎ নিজের ক্রিকেট-জীবনে ছেদ টেনে দিলেন লিলি। একেবারে আকস্মিকভাবে। এরপর সকলের নজর ঘুরে গিয়েছিল 'বিগ বব'এর দিকে। কারণ লিলির সাফল্য-চূড়া পেরিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করার সম্ভাব্যদের তালিকায় বব উইলিসের নামটাই ছিল এক নম্বর জায়গায়। বিগত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের একপেশে মরসুম শুরু হওয়ার আগে সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রিকেট আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল : বব উইলিস এই সিরিজে ডেনিস লিলির রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারবেন কি না। যদিও স্থিরভাবে এ-ব্যাপারে কেউ 'হ্যাঁ' বলতে পারেন না, তবু সকলেরই আশা ছিল, উইলিস হয়তো এই মরসুমেই নতুন বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হবেন। যদি তা নাও হয়, তবে চিন্তার কিছু নেই। সামনেই রয়েছে ভারত-সফর। উইলিস সিদ্ধিলাভ করবেনই।

কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার দিন সকালেই একটি নাটকীয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, এই মরসুমই তাঁর জীবনের শেষ আন্তর্জাতিক খেলা। এরপর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে তিনি অবসর নেবেন। অবাক হয়ে গেল সারা পৃথিবী। উইলিস কী বলছেন! হাতের মুঠোয় সোনার সুযোগ। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? কারণ হিসেবে উইলিস বললেন, "শরীর আর বইছে না।" অন্য সম্ভাবনার কথাও লোকের মনে উঁকি দিল। কেউ কেউ ভাবল, ওসব বাজে কথা। আসলে অধিনায়কের টুপিটা উইলিসের মাথা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে বলে মনে-মনে চটে গেছেন উইলিস। রাগ করে তো আর নির্বাচন কমিটির সদস্যদের ক্ষতি করার কথা ভাবা যায় না। সেটা ভদ্রলোকের কাজ নয়। তাই এভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন উইলিস। যেমন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার চতুর অফস্পিনার ব্রুস ইয়ার্ডলে। স্রেফ অভিমানবশত।

চতুর্থ টেস্টের আগে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে রায় দিলেন, না, উইলিস ফিট নন। তার আগে নিজের কাউন্টি দল ওয়ারউইকশায়ারের সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের খেলাতেও উইলিস পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় মাঠে নামতে পারেননি। পায়ে, কোমরে যন্ত্রণা তাঁকে রীতিমত কষ্ট দিচ্ছিল। তবু নিজের দল, তাই শারীরিক অপটুতা সত্ত্বেও মানসিক দুর্বলতাবশত খেলেছিলেন। আসলে এই ফাস্টবোলারের শরীর অনেকদিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, গত শীতের সময় ইংল্যাণ্ড দলের পাকিস্তান সফরের সময়েই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে উইলিসকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল।

কেন অবসর নিচ্ছেন, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "বড় ক্রিকেট ম্যাচ খেলার জন্য আমি মানসিকভাবে এখনও প্রস্তুত হতে পারি, কিন্তু নতুন বলে প্রথম দিকে বল করতে যে ক্লান্তি আসে, তা আমার শরীরের অনেক শক্তি নিংড়ে বার করে নেয়। ফাস্ট বোলিংয়ের জন্য সারাদিন ধরে এবং পাঁচদিনের জন্যই উঁচু তারে বাঁধা শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োজন। আমার পক্ষে এখন সেই ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সকালের স্পেলের পর সত্যিই বড় কষ্ট হয়।"

অর্থাৎ, লিলির রেকর্ড আরও বেশ কিছুদিন অম্লান থাকবে। উইলিসের সংগ্রহ ৩২৫টি উইকেট। এখন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে মস্ত আশা—ইয়ান বথাম। সদ্য সদ্য তাঁর শিকারের সংখ্যা তিনশোর কোঠা পেরিয়েছে। উইলিসের অসমাপ্ত কাজ হয়তো তাঁকেই শেষ করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে বিশ্বরেকর্ডটা। কিন্তু বথাম সম্প্রতি যা খেলেছেন, তাও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। যাই হোক, উইলিসের দীর্ঘদিনের শ্রম চরম পুরস্কার পেল না।

অবসর ঘোষণা করার সময় উইলিসের চোখে কেউ কি দু'ফোঁটা টলটলে জল দেখতে পেয়েছিলেন?

অস্ট্রেলিয়া আসছে

মণীশ মৌলিক

অস্ট্রেলিয়া আসছে। রণজি ট্রফির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ভারতে আসছে। ভাবছ বুঝি, পাঁচটি টেস্টের ঠাসা সিরিজ বেশ তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করা যাবে!

কিম হিউজ

কিন্তু না, এবার তা হবে না। এবারে অস্ট্রেলিয়া দল কোনো টেস্ট ম্যাচই খেলবে না। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর, অর্থাৎ সতেরো দিনের সফরে অস্ট্রেলিয়া নানা জায়গায় পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলবে। সঙ্গে ফাউ, বোম্বাইয়ের সঙ্গে একটি বিশেষ একদিনের খেলা। তিরিশবার রণজি ট্রফি জয়ের অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করেছে বোম্বাই। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বোর্ড তাই বর্তমান রণজি ট্রফি-জয়ী দলটির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার 'স্পেশাল' শক্তিপরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। টেস্ট নেই বলে হয়তো তোমাদের মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু মনে রেখো, ছ'টা একদিনের খেলার উত্তেজনাও কম নয়। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান ভারতের মনে দগদগে ঘা—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে সে গো-হারান হেরে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ফুঁসছে বিশ্বকাপের কথা মনে করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো তারাও শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, ভীষণভাবে। তা ছাড়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুখোমুখি হওয়ার আগে, ভারতে এই ম্যাচগুলোকে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেবে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া নির্বাচিত দল ঘোষণা করে জুলাই মাসের মাঝামাঝি। চোদ্দ-সদস্যের দলটির অধিনায়ক হিসেবে কিম হিউজের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সহ-অধিনায়কের সম্মান দেওয়া হয়েছে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান অ্যালান বর্ডারকে। বাঁ-হাতি বর্ডার এখন তাঁর দলের মধ্যমণি। মনে আছে নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত অস্ট্রেলিয়ার পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমেছিলেন বর্ডার। সমস্ত পৃথিবী মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিল বর্ডারের। সেই বর্ডারের খেলা তোমরা আবার দেখতে পাবে। বাকি বারোজনের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের কয়েকজনকে তোমরা অবশ্য আগেও দেখেছ। হগকে ভোলোনি বোধহয়। ইডেনে বল করতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন রডনি হগ। বাঁ-হাতি গ্রাহাম ইয়ালোপের চমৎকার খেলার কথাও ভোলা কঠিন। গ্রেম উডের ছবিটাও অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা নয়। এঁরা সকলেই কিম হিউজের অধিনায়কত্বে খেলে গেছেন। আর হ্যাঁ, জিওফ লসনও এসেছিলেন।

অ্যালান বর্ডার

এ ছাড়া সফরকারী দলে তোমরা দেখতে পাবে—মারে বেনেট, টম হোগান, জন ম্যাগুইর, ওয়েন ফিলিপস, কার্ল রেকম্যান, গ্রেগ রিচি, স্টিভ স্মিথ ও কেপলার ওয়েসেল্‌সকে। অবাক ব্যাপার, দেখছ তো, দলে ডেভিড হুকসের মতো চমৎকার ব্যাটসম্যানের নাম নেই। আরও লক্ষ করার বিষয়, চৌকস খেলোয়াড় গ্রেগ ম্যাথুজও নির্বাচিতের তালিকায় অনুপস্থিত। অথচ এই দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়, বিশেষত একদিনের ম্যাচে। ব্যাপারটা সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে।

অধিনায়ক হিউজ এই ভারত সফরকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বকাপের কথা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের কথা মনে রেখে তিনি বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়ার মান ফিরিয়ে আনার জন্য খেলোয়াড়দের সুনাম বজায় রেখে খেলতেই হবে। অস্ট্রেলিয়া দল ও ক্রিকেট বোর্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারানো। তার জন্য খেলোয়াড়দের সব শক্তি উজাড় করে দিতে হবে।" সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, অস্ট্রেলিয়া দল ভারতকে হারাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ভারতও চোয়াল কষে লড়বে। সব মিলিয়ে বেশ জমে উঠবে ব্যাপারটা। টেস্টের জন্য আক্ষেপ? সেটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ড তো আসছেই।

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন **সানলাইট**

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—মাত্র ৬ টাকা ৩৫ পয়সায়।

মাত্র
টা. ৬·৩৫
(স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

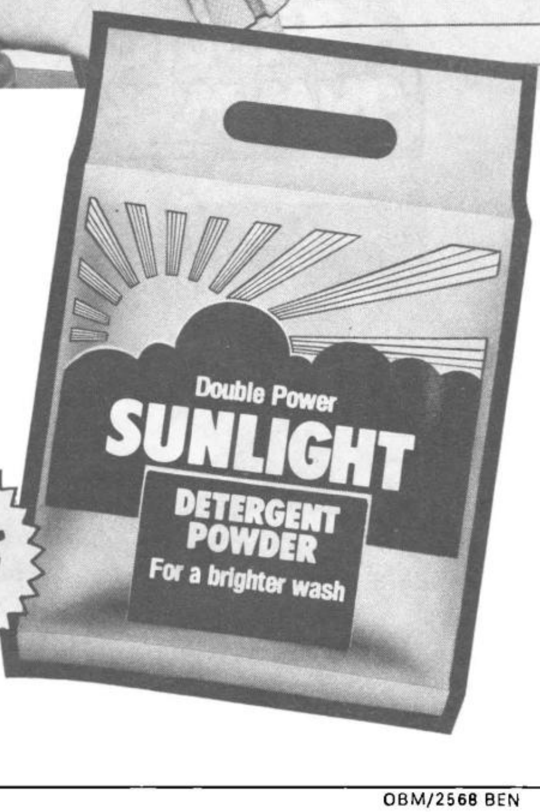

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568 BEN

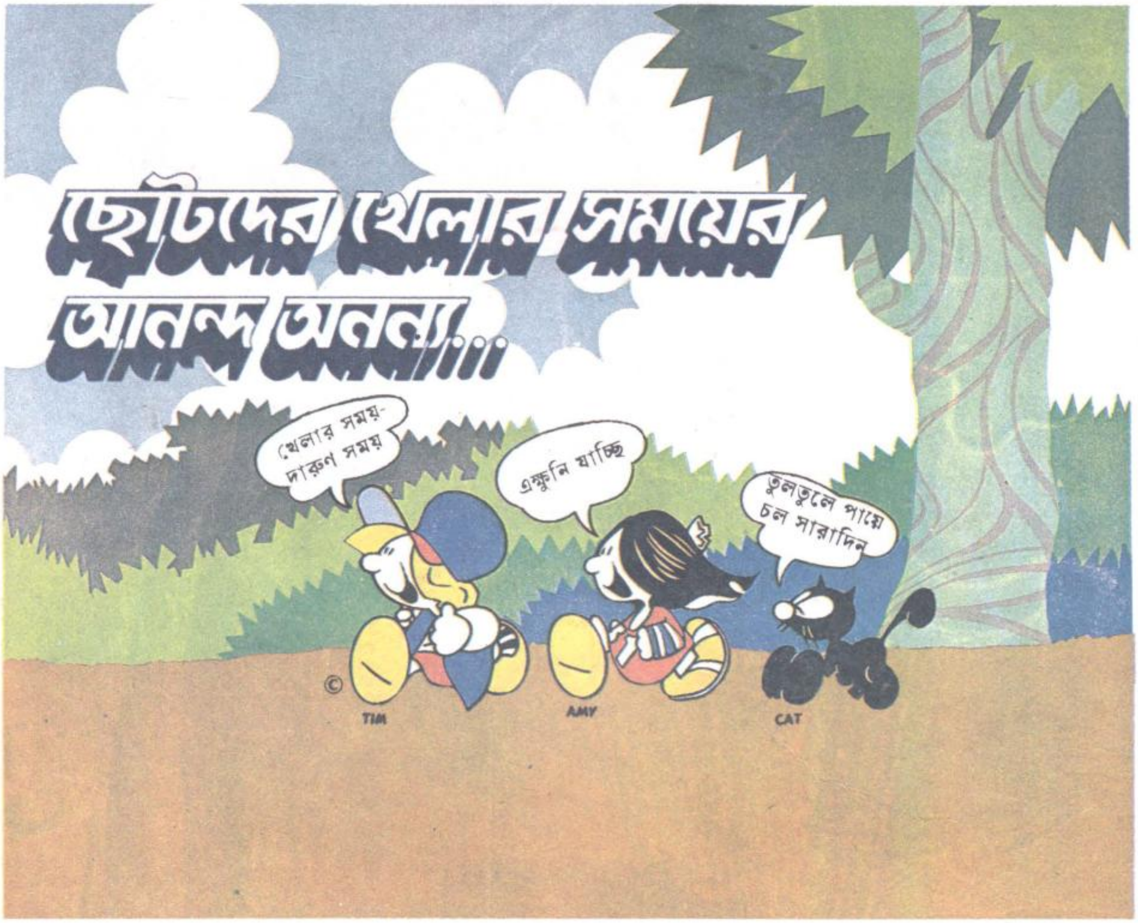

Bubble gummers

বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে
এক মজাদার জুতো

বিশ্বজোড়া নাম। সারা পৃথিবীর বাচ্চাদের কাছে বাবলগামারস্ জুতো একটি দারুণ আকর্ষণ। নানা রঙে হরেক সাইজে। সোয়েড, চামড়া ও ক্যানভাসে পাওয়া যাচ্ছে জুতো এবং স্যাণ্ডাল।

ছোটদের কথা ভেবেই—বাবলগামারস্ তৈরী।

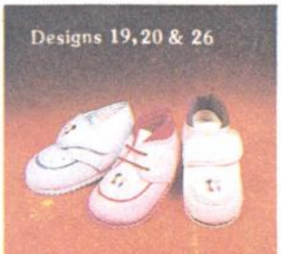

Bata

অগ্রণী BSC-র দোকানেও পাওয়া যায়

React-B-1/84